সাদাকে সাদা
ও কালোকে কালো
বলার
একমাত্র
সহর্ষ মাসিকপত্র

ফেব্রুয়ারি ২০০৩

পত্রপাঠ

৩য় বর্ষ।। ৭ম সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য নয়

দাম : ৮ টাকা

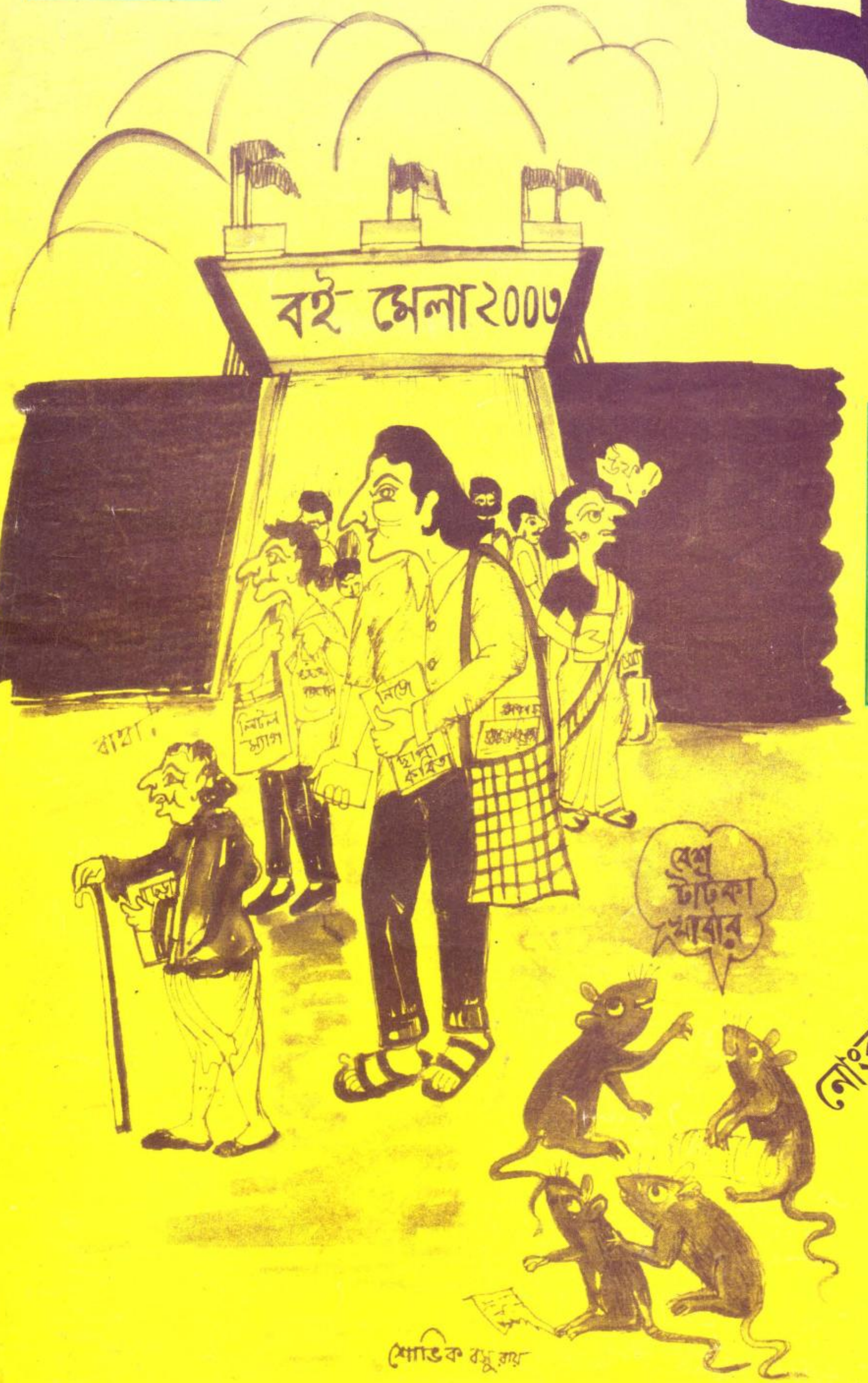

কাউকে হাসানোর
কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর
কাগজ

নোংরা জলের বই-তরণী
বই-তরণী বাইবে কে

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

গোমড়া মুখে আর থাকা নয়। সারা বছরের হাসি-মজার আগাম বায়না করে যান।

মাত্র ১২০ টাকা দিয়ে পত্রপাঠের এক বছরের সডাক গ্রাহক হোন। আর সঙ্গে নিয়ে যান একটি সুন্দর দেওয়াল ঘড়ি

একদম

বিনামূল্যে

উপহার স্টক থাকা পর্যন্ত।
পেতে চাইলে কালকের জন্যে
অপেক্ষা করবেন না।
চলে আসুন আজই।

বইমেলা স্টল নং :

এস-২৯৪

হাসানোর জন্য আমরা দায়ী ফাঁসানোর জন্যে নয়।

পত্রপাঠ

১০বি, (অথবা ১০জে) ফার্ণ রোড,
কলকাতা-৭০০০১৯, ফোন : ২৪৪০-৩৮০৩

নোংরা জলের বই-তরণী

বই-তরণী বাইবে কে?

ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ।। ৩য় বর্ষ।। ৭ম সংখ্যা

দাম : ৮ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

পুরনো কাসুন্দি : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঁচুঠাকুর' থেকে ❑ ৪

রসকাব্য : পরচড়চা-পড় ● দিগম্বর বস্ত্রওয়ালা ❑ ১১ কাঙালি ● সৌরেন বসু ❑ ৩৫

গল্প : গভেট ● প্রবীর মণ্ডল ❑ ১৭ একটি ধোঁয়াটে গপ্প ● পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী ❑ ১৮

নিয়মিত কলম : অকপটে : পারভার্টেড উইপোকারা ● সমরেশ মজুমদার ❑ ২২ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি : বই নেবে-গো—বাংলা বই ● চরণ বৈরাগী ❑ ১২ তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম ● তারাপদ রায় ❑ ৭ কড়চা ২০০৩ : সাংস্কৃতিক বিপ্লব ● অমিতাভ সান্যাল ❑ ৪১

ধারাবাহিক রসোপন্যাস : মারায়ণ ● পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী ❑ ২৮

বই-তরণী : বঙ্গ ভারতীর রঙ্গদর্শন ● সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ❑ ৩৪ বই-ঠগী গল্প ● পিনাকী ভাদুড়ী ❑ ৪৪

রসনাট্য : ঠাট্টা ● সনৎকুমার মিত্র ❑ ৪৬

রসগদ্য : ডায়াবেটিস ● মনোজিৎ বিশ্বামিত্র ❑ ২১ আবার বাঁচি ● দিব্যেন্দু দাস ❑ ২৭ হাজার রাজার বাজার ● অলোক বসু ❑ ৩৬ শীতকাল ● আইভান হো হো ❑ ৪৩

এছাড়া : বিচিত্রা ● দিব্যলোচন কলমধারী ❑ ১৫ সং-এর যোগ্যতা ● শরদিন্দু কর ❑ ২৬ চিরকালের কৌতুক ● কাকলি সরকার ❑ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ : সম্পাদকীয় ❑ ৩ কার্টুন ❑ ২,১০ পত্রপাঠ জবাব ❑ ৮ সাহিত্য দুঃসংবাদ ❑ ৯ পথঘাটের কিসসা ❑ ১৪ ট্যারা চোখে ❑ ১৬ জবর খবর ❑ ২৪ রাশি চক্কোর ❑ ৩৩ হেঁসেল ❑ ৪০ পুরুষ মহল ❑ ৪৭ মহিলা মহল ❑ ৪৮

প্রচ্ছদের ছবি : শোভিক বসু রায়

অলঙ্করণ : গুরুপ্রসাদ দাস ● শোভিক বসু রায় ● সুপর্ণা মণ্ডল

কর্ম সহায়ক : অচিন্ত্য কারক

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ● তারাপদ রায় ● সমরেশ মজুমদার ● শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : **শেখর আহমেদ**

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় ● প্রদ্যোত কুমার মিত্র ● বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● অঞ্জনা দত্ত ● ডঃ শুভাশিস নিয়োগী ● শচীন মিত্র

পারভার্টেড উইপোকারা ২২

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ণ রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । ফোন : ২৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, রাত্রি ১০টার পর)

সম্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্ণ রোড, কলি-১৯ , মুদ্রণ : দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯

কার্টুন : শোভিক বসু রায়

সম্পাদকীয়

বই-তরণীর কথা

বৈতরণী পার হওয়া সহজসাধ্য নহে। গরুর ন্যাজমাত্র ভরসা। এক এবং অদ্বিতীয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ খড়-ভুষি ঘাস-বিচালি জোগাইলে গরু যখন দুগ্ধভারাবনত বাঁটও ধরিতে দেয় তখন ন্যাজ কি আর ধরিতে দিবে না? অবশ্যই দিবে। বৈতরণীর কাল-জলে হাবুডুবু খাইতে খাইতেও গরুর উপরে এই নিশ্চিন্ত ভরসা করা যায়। কিন্তু বই-তরণী? সেটি যে বড় আদিম জলে ভাসিতেছে। আদিরসের তরঙ্গ তথায় উথাল-পাথাল। আর কি মজা, তরণীটি ফুটা হইয়াছে, দমকে দমকে উঠিতেছে আদি রসধারা। আঁজলা ভরিয়া বই-ব্যাপারীগণ খরিদ্দারকে আহ্বান করিতেছেন। বই-বিমুখ নাইট ক্লাবাসক্ত, ইণ্টারনেটের নীল ছবিতে মগ্ন বাবুরা নাকি তবেই মুখ ফিরাইবেন। এই বটতলা-কামরস পাতায় পাতায় মাখিয়া অতঃপর বই-সোনা গাছতলায় দাঁড়াইবে। কামসূত্র কিংবা সচিত্র যৌন-বিজ্ঞানের এইরূপে প্র্যাকটিকাল হইবে। আদিম আদম সাহেব লজ্জাজ্ঞান লাভের পর আচ্ছাদন খুঁজিয়াছিলেন। আমাদিগের বই-তরণীর যাত্রীগণের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে। তাঁহারা তাই আচ্ছাদন উন্মোচনে মাতিয়াছেন। আমাদিগের কোনো জ্ঞানই নাই, পাড়ে দাঁড়াইয়া তরণীটির সলিল সমাধি-যাত্রা লক্ষ্য করিতেছি। হে পাঠক, উহাদের জন্য দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিও, নিজেদের জন্যও বটে।

পঞ্চানন্দ মুমূর্ষু দেহে জীবনসঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব— খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্ব্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুরস্তু!

পুরনো কাসুন্দি

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঁচুঠাকুর' থেকে

তামাসা নয়

এই ত ভবের হাটে রসের পসরা মাথায় উপস্থিত হওয়া গেল। এই ত ভবসাগরে রঙ্গিল পান্‌সী ভাসান গেল! এই ত ভবের ঘানিতে আত্ম-যোড়ন করা গেল! এই ত ভবের অসারে নামা গেল! এই ত ভবলীলা আরম্ভ হইল। এখন দেখা যাউক— তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন।

পঞ্চানন্দ বাহির হইল. লোক-সমাজে এই অলোক-সামাজিক—অলোক-সামান্যই বলিতাম, কিন্তু তাহা হইলে অনুপ্রাস ভঙ্গ হয়—এই অলোক-সামাজিক বর্ত্তিকা এখন নয়নানন্দদায়িনী হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ আলোক কতদিন অন্তরে ভারত উজ্জ্বল করিবে? সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু সূর্য্যের আলোক অতি তীব্র— "অসূর্য্যম্পশ্যরূপ!" চন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাসে একবার মাত্র পূর্ণমাত্রায় আত্ম-বিকাশ করেন; তদ্‌ভিন্ন পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রে কলঙ্ক আছে! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ—

"সুবর্ণ-দেউটি যথা তুলসীর মূলে"—

মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে, বাতাসে নিবিয়া যায়, এবং ঠিকা ধরাইবার সময়ে দীপ-ছায়া উপস্থিত হয়, তবে এ আলোক কেমন?

এ আলোক কেমন? গভীরভাবে এই গুরু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য। এ আলোক— বলিয়াই ফেলি—এ আলোক করাল কাদম্বিনীর অম্বরবিদারিণী সৌদামিনী-সদৃশ; ভৈরবী শ্যামার সমর-রঙ্গকালীন হাসির মত। ইহাতে জগৎ চকিত হইবে, স্তম্ভিত হইবে, ঘন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হইবে! ভয়ে বিহ্বল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। না-ই পাইল, লেখা ত জমিয়া গেল! যাহা হইবে, তাহা হইবে। অদৃষ্টবাদ, কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে না।

অসময়ে যে বন্ধু, সে-ই বন্ধু—"—শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ।"— পঞ্চানন্দ সেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চানন্দ সেই শ্মশানবন্ধু। ষড়দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল; ঔরস পুত্রের অভাবে আরও একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা মনুসংহিতায় আছে: সেই জন্য ষড়দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্য বঙ্গ-দর্শন আর্য্যদর্শন শ্যাম-দেশোদ্ভব যমজ ভ্রাতার ন্যায় কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাঁহাদেরও অন্তিমদশা— মুখ ব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি-খাইবার জন্য, আর কি নীরব থাকিবার সময়? অতএব উঠ, বন্ধুগণ উঠ! জাগ ভারতের হিতব্রত, জাগো!— পঞ্চানন্দ স্বয়ং উপস্থিত। (এখানে বুঝিতে হইবে). —অতএব উপস্থিত।

পঞ্চানন্দ মুমুর্ষু দেহে জীবনসঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্ব্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুরস্তু!

"বঙ্গ-দর্শন" প্রভৃতি সাময়িক পত্র; সেই জন্য মাসে মাসে দেখা দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালী—স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতির এমন প্রতিজ্ঞা থাকে না। প্রথম প্রথম দুদিন দশ দিন; তাহার পরে—ভগবানকি হাত! পঞ্চানন্দ স্ত্রীলোক নহে।

পঞ্চানন্দ দুঃসময়ের বন্ধু, সেই জন্য অসাময়িক, যখন ফুরসৎ, তখনি সাক্ষাৎ।

পঞ্চানন্দের দর্শনী—যেবার যেমন মর্জ্জি। আধুনিক "দর্শন" সমূহের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেহ কেহ দিয়া থাকেন; সে শ্রেণীর লোককে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, তাঁহারা যখন চব্বিশ মাসে বৎসর গণনা করিয়া পরিতুষ্ট তখন পঞ্চানন্দকেও যাহা ইচ্ছা দিয়া রাখিতে পারেন, অগ্রাহ্য হইবে না!

এখন আশীর্ব্বাদ করি, এই শুক্তির মুক্তা, দেবতার ইন্দ্র, নন্দনের পারিজাত, স্নেহের পঞ্চানন্দ—দীর্ঘজীবী হইয়া নিজের আয়ুবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি এবং অর্থবৃদ্ধি ও সর্ব্ব সমৃদ্ধির কামনা করিতে রহুন।—এমেন্।

ভূমিকা

নন্দ উবাচ।
হরিতে হর, হরে হরি,
দুই দেহ এক আত্মা ভিন্ন কভু নয়।
দুই আত্মা এক দেহ ভিন্ন কভু হয়?

অতএব হরি হর দুয়ে এক, একে দুই; পঞ্চানন্দ তদ্বৎ।

তথাপি রূপভেদে উপাসনাভেদ; অবতারভেদে লীলাভেদ; সেই জন্য—নন্দেরও ভূমিকাভেদ আছে। এ ভেদে যিনি ভয় পাইবেন তিনি চৈত্র মাসের কেহ নন, চৈত্র মাস তাঁহার কেহ নয়; সকের জলপান, সাড়ে আঠার ভাজা, চণক-চুর্ণ, চাল-কলাই ভাজায় তাঁহার অধিকার নাই। তিনি দন্তহীন বৃদ্ধ, চর্ব্বণরসে বঞ্চিত। যখন দুর্ভিক্ষ জন্য আর্ত্তনাদ-পুরঃসর আমরা অশ্রুপাত করিব, তখন চক্ষের সেই জলের দু-ফোঁটা, তাঁহারা পাইবেন। ইহার অধিক প্রত্যাশা করিলে—যাও, কুছ নেহি মিলে গা।

শুকদেব গোস্বামী লায়েক হইয়া, তাহার পর ভূমিষ্ঠ হন; আর বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণ মৃত্যুর পরে বিদ্যাভাস আরম্ভ করেন; আমরা দুয়ের বা'র। আমাদের যে কিছু বিদ্যা বুদ্ধি, তাহা জন্মগ্রহণের পর উপার্জ্জিত; এবং আমাদের যে শিক্ষা, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমাহিত হইবে।

পঞ্চানন্দ লিখিবেন কি সম্পাদিবেন, সুতরাং অগত্যা এই প্রশ্ন উঠিতেছে। বঙ্গোজ্জ্বলোজ্জ্বলা সমুদায় পত্র-পত্রিকাতেই বাঙ্গালার সমস্ত প্রধান প্রধান লেখক লিখিয়া থাকেন; এমতাবস্থায় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম চাটুর্য্যে, সেক্স্পিয়ার, গেটে, এমার্সন্, কার্লাইল এবং রাজা রামমোহন রায় এই কয়েকজনকে লেখকশ্রেণীতে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া আমরা আসরে অবতীর্ণ হইলাম। ইহাতে কেহ দুঃখিত হইবেন না। সত্বরেই যাহাতে লেখকসংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; 'শকুন্তলাগৃহের'' বাহিরে যে শাদা ফর্দ্দ ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা আমাদেরই; সেখানকার অনুগ্রাহকবর্গ তথাকার স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনান্তর সেই ফর্দ্দে নাম লিখিয়া যাইবেন; আমরা তাঁহাদের বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া তদ্দিগের দ্বারা রচাইব।

পঞ্চানন্দের এক কলম অর্থাৎ এক লেখনী লিখিলে দুই টাকা দেওয়া যাইবে; যাঁহাদের লেখা পত্রস্থ হইবে, তাঁহাদিকে দেওয়া যাইবে না, যাঁহারা বেতনের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন, তাঁহাদের লেখা লওয়া যাইবে না। পঞ্চানন্দ কখন দেউলিয়া পড়িবে না, বুক ঠুকিয়া এ কথা ঘোষণা করা যাইতেছে।

এবারে যে যে প্রবন্ধ হইল, তাহা পাঠ-সাপেক্ষ; সুতরাং তৎসমস্তের গুণ গান করিয়া পঞ্চানন্দ জঘন্য আত্ম-তৃপ্তিসাধন করিতে পরাঙ্মুখ। এতদ্ভিন্ন পঞ্চানন অতিশয় লাজুক, সেই জন্য প্রথম মজলিসে গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে চাহেন না। এবারে নিদাঘের নব-জলদ-সঞ্চার, করকা-নির্ঘোষ, অশনিসম্পাত, বিদ্যুদ্দাম, এবং কদাচ শিলাবর্ষণে পর্যবসান। কিন্তু আগামী বারে প্রাবৃটের মুষলধার, ধরিত্রী-কর্দ্দম-চর্চ্চিতবপু, দর্দ্দুরের স্বরসাধন ও গায়রহ মনোহার্য্যের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান দেখা যাইবে। ঈশ্বর বিদ্যাগাসর ওজোময়ী সীতার বনবাসের ছন্দে "মনসার ভাসান," রামমোহন রায় "কুলবালার বিষম জ্বালা," বঙ্কিম চাটুয্যে "স্ত্রী-পুরুষের জাতিভেদ কত দিন হইয়াছে এবং তাহা উন্মুলনের উপায় কি?" প্রবন্ধ দিতে প্রতিশ্রাব করিয়াছেন। অপর শুভ কিমধিকমিতি।

পঞ্চানন্দের আত্মচরিত

অবতরণিকা

অনেকগুলি কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে এবং প্রকাশ করিতে হইয়াছে; জীবনীতে প্রবেশ করিবার অগ্রে, সেই কারণগুলি ব্যক্ত করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রথম কারণ, আমার অনিচ্ছা। আমার বিশ্বাস যে, ছাপার অক্ষরে, পুস্তকের আকারে, দোকানদারের মাথায়, ফেরিওলার বোচকায়, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জল-খাবারের ঘরে, আমার এই আত্মচরিত গৌরব বিকীর্ণ করিবে; আমার বিশ্বাস যে, উই কি ইন্দুর যদি শত্রুতা না করে, ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম যদি বাদ না সাধে, তবে আমার এই অতুলকীর্ত্তি যুগে যুগে বর্ত্তমান রহিয়া কালের লোল-করাল রসনাকে লালায়িত করিতে থাকিবে; অথচ কখন তাহার খোরাক হইবে না। গ্রন্থ পঠিত হইলে ক্ষয় পায়, ক্রমে লয় পায়; প্রথমে মলাট যায়, তার পর সেলাই যায়, ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন। কোন কোন গ্রন্থকার এই শোকজনক, লজ্জাজনক, ঘৃণাজনক ভাবে নিজকীর্তি বিধ্বস্ত এবং কালের করালকবলে কবলিত হইতে দেখিয়াও সন্তুষ্ট হন সত্য; কিন্তু অনেকেরই ভাগ্য অন্যরূপ। আমার সাধ থাকিলেও শঙ্কা নাই। সেইজন্য আমার অনিচ্ছা, এবং এই অনিচ্ছা নিতান্ত বেগবতী বলিয়াই এই আত্মচরিতের

জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ নামক এক ব্যক্তি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণে পরিতুষ্ট না হইয়া মৃত্যুগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন।

প্রকাশ। শতকরা নিরানব্বই খানি পুস্তকের ভূমিকা খুলিয়া দেখ, আমার বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা নাই, লিখিলে ছাপাইতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নাচার, বন্ধুবান্ধব নাছাড়, তাঁহাদের অনুরোধে পুস্তক বাহির করিতে হয়। আমার বন্ধুবান্ধব নাই, কেবল অনিচ্ছাটুকু আছে। সেই জন্য এ জীবন বৃত্তান্ত সহস্র সহস্র দীন-দুঃখীর ভরণপোষণ জন্য সংসারে অগ্রসর হইল। কতক্ষণে আমার মত মহানুভবগণের প্রকাশ প্রবৃত্তি জন্মিবে, এই উদ্দেশে কাগজওয়ালা ছাপাওয়ালা প্রভৃতি কত কত ওয়ালা, তীর্থের কাকের মত হা-প্রত্যাশ করিয়া বসিয়া আছে,—যখন এই কথা আমার মনে হয়, তখন চক্ষে জল আইসে; ইহারা কেহই দাম পাইবে না, সুতরাং নালিশবন্দ হইবে, এই আশ্বাসে কত কত নিরাশ্রয় উকীল, মোক্তার, দালাল, দাগাবাজ, ছোট বড় আদালতে নিয়ত পরিভ্রাম্যমাণ হইতেছে—এ চিত্র যখন আমার অন্তরে উদিত হয়, তখন আমি নিজমহত্ত্ব অনুভব করিয়া অশ্রুপাত করি; তাহার পর ইহারা মামলা জিতিয়া দেনার দায়ে আমাকে ধরিতে আসিবে—এই কল্পনায় যখন আমার মস্তিষ্ক আন্দোলিত এবং সঞ্চালিত হইয়া উঠে, তখন আমি ভাবী ভয়ে কান্দিয়া ফেলি। তথাপি আমার অনিচ্ছা, এবং সেই অনিচ্ছা হেতু এই প্রকাশ।

দ্বিতীয় কারণ, বিদ্যাভূষণ ভায়া (১)। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ নামক একব্যক্তি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণে পরিতুষ্ট না হইয়া মৃত্যুগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন। তিনিও—অর্থাৎ মিল্—আমার মত আত্মচরিত লেখেন, কিন্তু তাহা ইংরেজীতে। বিদ্যাভূষণ ভায়া নিঃস্বার্থভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সেই আত্ম-চরিতের অনুবাদ করিয়াছেন; কেহই সে অনুবাদ পড়ে না, কেহই সে অনুবাদ কেনে না, তবু স্বার্থত্যাগ এমনই বস্তু, মিল এখন বাঙ্গালা অক্ষরে অমর। হনুমান অমর বর লাভ করিয়া নানা মূর্ত্তিতে আমাদিগকে জ্বালাতন করিতেছেন; দাঁতাখিঁচোন, আঁচড়ান, কামড়ান,—ভয়ে কথাটি কহিবার যো নাই। আমার এই সৌভাগ্য হইবে না বলিয়া আশঙ্কা আছে; কিন্তু আমার নাম অমর হইতে পারে না, ইহা তোমাকে কে বলিল? অফ্রিকার মরুভূমে, নায়াগারার জলপ্রপাতে, আল্‌প্সের উত্তুঙ্গ শিখরে, সুয়েজের সঙ্কীর্ণ খালে; চীনে তাতারে; ফ্রান্সে, জর্ম্মাণীতে, মাড্রিডে, সেণ্টপিটার্সবর্গে (২),—এই ত্রিভুবনে আমার জন্য একটিও বিদ্যাভূষণ নাই, ইহা কোন্ প্রাণে বিশ্বাস করিব? তবে, বল দেখি, আমি যদি না লিখিয়া রাখি, তবে সে বিদ্যাভূষণটির দশা কি হইবে? অগত্যা আমাকে আত্মচরিত লিখিতে হইতেছে।

তৃতীয় কারণ, সাফ পরোপকার। প্রকৃতিতে প্রকৃত মাধুরী নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন। সেই দুঃখে কল্পনা দেবীর উদরে, বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তকের ঔরসে, কতকগুলি মাধুরী এবং সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি; পূর্ণচন্দ্রের (৩) উপর সেইগুলি লালন-পালনের ভার। কিন্তু আমি মাধুরীর অবতার, সৌন্দর্য্যের রূপ। এই আত্মচরিত লিখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাথা বাঁচিবে; পূর্ণচন্দ্রের নরকঘাঁট্যা ঘুচিবে, সাধও মিটিবে। বিলাতের এক মেম বিজ্ঞানের ক্ষোভ নিবারণ উদ্দেশে ব্যবচ্ছেদ জন্য নিজ মৃতদেহ উইল করিয়া যান; পূর্ণচন্দ্রের ক্ষোভ নিবারণ জন্য আমি এই আত্মচরিত দান করিলাম। উইল করা অপেক্ষা দান করায় মাহাত্ম্য অধিক।

তিন কারণের উল্লেখ করিলাম; আরও তেত্রিশ কোটি আছে; কিন্তু আমার বিচারে সেগুলির কথা তুলিবার দরকার নাই।

---

(১) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

(২) রুষিয়ার রাজধানী, বর্ত্তমান নাম—লেলিনগ্রাড।

(৩) পূর্ণচন্দ্র বসু, যাঁহার "কাব্য-সুন্দরী"তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঘটিত স্ত্রী-চরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনা আছে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন । (গ্রন্থকারকে বন্ধু) কেমন হে, তোমার বই কাট্‌ছে কেমন?

উত্তর । উই আর ইঁদুর—বিলক্ষণ।

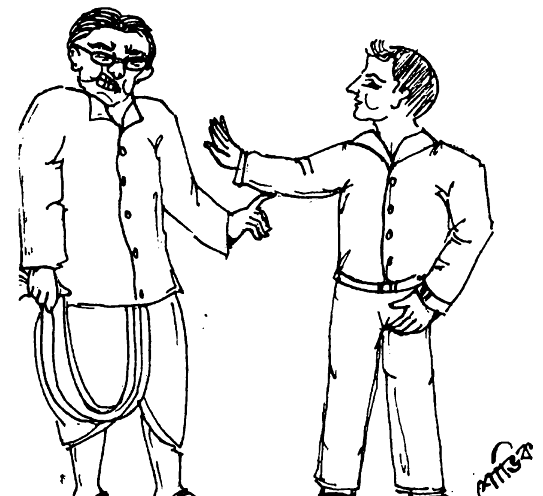

প্রশ্ন । "সাহিত্যসভা" কাহাকে বলে?

উত্তর । একটা বয়াটে ছেলে; পড়াশুনায় মন নাই; আস্বাটুকু বিলক্ষণ; চিঠিপত্র ছাপাইয়া দরখাস্ত করে, ভিক্ষা করে, অভিনন্দন দেয়, শেষে ধরা পড়ে।

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়

গঙ্গারাম বিমান সংস্থার কাউণ্টারে মুখ গলিয়ে বলল, স্যুটকেস দুটো ব্যাঙ্ককে যাবে। আর ব্যাগ দুটোর মধ্যে একটা টোকিওতে একটা সানফ্রান্সিসকোয় যাবে।

বৎসরান্তে একবার ছেলের কাছে যাই। জায়গাটা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারে—সুদূর মার্কিন দেশে। ক্যালিফোর্ণিয়া নামক স্বর্গরাজ্যে।

এখন তো ব্যাপারটা নিয়মিত হয়ে গেছে। লোকে আর বিশেষ কৌতূহল দেখায় না। বড়জোর খোঁজখবর নেয় আমি ও মিনতি কলকাতায় আছি কি না। আজকাল আমার অনুগত ভাই এবং শ্যালক ছাড়া বিমানবন্দরে Seeoff করতে কেউ আসে না। তাছাড়া ব্যাপারটা খরচার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঁচিশ টাকা না পঞ্চাশ টাকা কত যেন প্রবেশ দক্ষিণা দিতে হয়।

বিদেশ যাওয়ার মুখে ৫০/- তো আর ৫০/- থাকে না। সেও হয়ে যায় এক ডলার কিম্বা পৌনে এক Pound. মানসিকভাবে তখন তার মূল্য যৎসামান্য।

তবুও বিমান বন্দর পর্যন্ত গঙ্গারাম আমার সঙ্গী হয়েছিল। রওনা হবার দিন গাড়িতে মালপত্তর তোলার সময় দেখি গঙ্গারাম এসে হাজির। মালপত্র গাড়ির পেছনের ডিকিতে সাজাচ্ছে। আমার তো ভক্তের সংখ্যা বেশি নেই, তাই গঙ্গারামের আগমনে ভালোই লাগল। কিন্তু ভদ্রতা করে বললাম, তুমি আবার কষ্ট করে এলে কেন?

গঙ্গারাম বলল, চলুন না যাই, আপনাকে ঠিকমতো তুলে দিয়ে আসি। গতবছর তো মালপত্র হারিয়ে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করেছিলেন।

বিমান বন্দরে পৌঁছে কি এক কৌশলে গঙ্গারাম আমাদের সঙ্গে বিমান সংস্থার কাউণ্টার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আমাদের সঙ্গে দুটো বড় স্যুটকেস আর দুটো ব্যাগ, এছাড়া দু'জনের সঙ্গেই হাতব্যাগ ইত্যাদি আছে। তা, সেগুলো তো সঙ্গেই থাকবে। কেবল বড় ব্যাগগুলো বিমানের পেটের মধ্যে যাবে।

গঙ্গারাম বিমান সংস্থার কাউণ্টারে মুখ গলিয়ে বলল, স্যুটকেস দুটো ব্যাঙ্ককে যাবে। আর ব্যাগ দুটোর মধ্যে একটা টোকিওতে একটা সানফ্রান্সিসকোয় যাবে।

গঙ্গারামের কথা শুনে আমি তো অবাক! বিমান সংস্থার কর্মচারীরা তথৈব চ। গঙ্গারাম তখন নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করল, গতবছর তো এই রকমই করেছিলেন। চকিতে আমার মনে পড়ল—ঠিক তাই। তিন জায়গায় না হলেও গতবছর দুটো ভিন্ন জায়গায় আমার মালপত্র চলে গিয়েছিল। বিদেশে এসে সব উদ্ধার করতে যথেষ্ট হাঙ্গামা হয়েছিল।

গঙ্গারামের বক্রোক্তির মানে বিমান সংস্থার কর্মীরাও বুঝতে পেরেছিল। তাঁরা হেসে বললেন, 'না না, সব ঠিকঠাক যাবে। আমরা ঠিকমতো ট্যাগ লাগিয়ে দেব।

সত্যি এবার সব মালপত্র ঠিকঠাক গিয়েছিল। গঙ্গাকে জীবনে এই একবার ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব

● আমার পিসু, বাবা, মেসো, কাকা, দাদা প্রত্যেকের মাথায় বেজায় টাক আছে। তা দেখে আমার মাঝেমধ্যে ভারী ভয় হয়। ওদের প্রত্যেকেরই ভালো টাকাপয়সাও রয়েছে। শুনেছি টাকা থাকলেই টাক হয়। ভবিষ্যতে যদি আমি টাকা রোজগার করি আমারও কি টাক গজাবে?

—টিঙ্কি দাস, মালদহ

❐ কথাটা উল্টো। আগে টাক, তারপর টাকা। লেগে পড়ুন জয় মা বলে।

● অনেক পত্রিকাই তো বিজ্ঞাপন, স্কুল আর্টিক্যাল, বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, তবে শুধু পত্রপাঠই কেন এত রোগা, পাতলা? কী দিলে মোটা হবে?

—বাবিন, কলকাতা-১৯

❐ লোকে রোগা হওয়ার জন্যে লাখটাকা খরচ করছে, জিম্‌-এ যাচ্ছে....উঃ। আপনি কি শত্রুপক্ষের লোক?

● আপনাদের সম্পাদকের সাহস তো কম নয়। তিনি পত্রিকায় অন্যান্য মান্যি ব্যক্তিদের সম্পর্কে যেভাবে সমালোচনা করছেন তাতে আর কিছুদিন বাদেই জেলের ঘানি, চোখের পানি এবং চোখ রাঙানি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি যেন অবিলম্বে পরনিন্দা, পরচর্চা বন্ধ করেন এবং নিজেকে নিয়েই যেন বেশি মাথা ঘামান। অন্যথায় বিপদ হবে!

—শ্যামল দাস, হুগলী

❐ আপনি কোন জঙ্গি বাহিনীর?!

● 'Old is gold'– কথাটা সত্যি?

—সাগরিকা সাহা, সন্তোষপুর

❐ কথাটা খুবই gold মেলে

● বিরহ না মিলন কার আকর্ষণ বেশি?

—বিনায়ক বসু, চন্দননগর, হুগলী

❐ ওই দু'জনের ছবি না দেখলে কিছু বলা যাচ্ছে না।

● আপনারা কোন জাতের বলুন তো?

—সেখ মোমিন, মেদিনীপুর

❐ বজ্জাতের শিরোমণি।

● আমি চেষ্টা করে, ওষুধপত্তর খেয়ে ওজন কমিয়েছি। কিন্তু ৬০ থেকে মাত্র ৫০-এ। পত্রপাঠ কী খেয়ে এমন রোগা থাকতে পারে।

—কিংশুক পাত্র, কুচবিহার

❐ স্রেফ পাঠকের গালমন্দ।

● 'চোখের বালি' আর 'চোরাবালি'-র মধ্যে পার্থক্য কি?

—অভয় কর, জলপাইগুড়ি

❐ প্রথমটা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। সেটা আছে আপনার বইয়ের তাকে। আর দ্বিতীয়টা আপনারই তৈরি, আছে আপনার পায়ের নিচে।

● আপনারা আমার ঘর-সংসার ভেঙে দিতে বসেছেন। পত্রপাঠ পড়ে আমার বউ আমাকে বাপ তুলে গালমন্দ করছে, মুখ ঝাম্‌টা দিচ্ছে, চড় ঘুষি লাথি—বলতে গেলে আর কিছুই বাকি নেই।

—নরোত্তম রায়, কলকাতা-১২

❐ দয়া করে এই সুসংবাদটা আমাদের বউদেরকে জানিয়ে দেবেন না।

● কবিতা কারা লেখে?

—জাহানারা খাতুন, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা

❐ যারা কিছুই করতে পারে না, এমনকি কবিতা লিখতেও।

● আপনারা যে এতদিন রাঁচিতে বন্দী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু প্রশ্ন—কেমন ছিলেন?

—সুহাস ঘোড়ুই, সাঁওতালডিহি

❐ খুব ভালো ছিলুম। আপনাদের পাল্লায় অন্তত পড়তে হত না। আবার ফিরে যাব ভাবছিলুম, কিন্তু রাঁচির ওপর যে টান আপনার দেখা যাচ্ছে.....

এরা যারা বুক-পাবলিশারের নলচে আড়াল করে বুক-টুক তো নস্যি, ব্রা-প্যান্টি পর্যন্ত খুলে ফেলে আরো ভেতরের মাল পাবলিশ করতে শুরু করেছে তাদের কোন নামে ডাকব?

সাহিত্য দুঃসংবাদ

> একেবারে হাড়কাটা গলি, এইসব মলাটে দেখিয়ে পকেট কাটার আদিম আয়োজন। সাহিত্যের ভড়ং করে এদের হাফ-গেরস্তপনা।

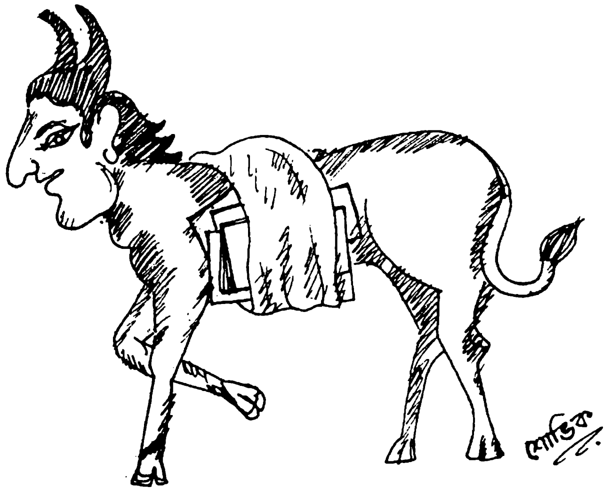

বই পাড়ার Sex-Pure পাবলিষাঁড়েরা

যাঁড়ের কথায় যাবার আগে স্কুলজীবনের কথাটা বলে নিই। কোন মহাপুরুষের কী অবদান স্যার জিজ্ঞেস করছেন। ক্লাস ফাইভ, সেকসন এ। রোল নম্বর ২৭-কে স্যার জিজ্ঞেস করলেন—মহাবীর কী করেছিলেন? রোল সাতাশ হচ্ছে গৌতম, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—স্যার, মহাবীর যৌনধর্ম প্রচার করেছিলেন। পরে এ নিয়ে গৌতমকে কম খ্যাপাইনি, ওর নামই দিয়েছিলাম 'মহাবীর'। কিন্তু বইপাড়ার সেইসব 'পাবলিষাঁড়' যাঁরা বইকে উচ্ছৃতলিঙ্গের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন তাদের কী নাম দেব? গৌতমের সেটা ছিল স্লিপ অফ টাং, আর এখন এরা যারা বুক-পাবলিশারের নলচে আড়াল করে বুক-টুক তো নস্যি, ব্রা-প্যান্টি পর্যন্ত খুলে ফেলে আরো ভেতরের মাল পাবলিশ করতে শুরু করেছে তাদের কোন নামে ডাকব? কলেজস্ট্রিটের Sex-Pure? না কি পাবলিক-ষাঁড়? এদের সংখ্যাই দেখি দিন দিন বেড়ে চলেছে। আগে যে যৌনতার বই বইবাজারে ছিল না তা নয়। ছিল। তাদের নাম ছিল 'যৌন বিজ্ঞান', 'সচিত্র যৌন বিজ্ঞান', 'দেহে এলো যৌবন' আর ফুটে হলদে সেলোফেনে মোড়া 'কোকশাস্ত্র' বা 'উতল রজনী'। কিন্তু সাহিত্যের ছদ্মবেশে এইসব 'অজস্র এক অসভ্য রজনী'রা ছিল না। এখন আবার বাংলায় ঠিক জমছে না, কান্ট্রি মেড ফরেন লিকারের মতো সাহেবদের লেখা বইয়ের ইচ্ছেমতো রগরগে অনুবাদ চলছে। এক 'পাবলিষাঁড়' তো শুধু এইসব মাল বিক্রি করেই লাল হয়ে গেল। আমাদের বচ্ছরকার কুম্ভমেলা 'কলকাতা পুস্তক মেলা'-য় এখন এরাই থিকথিক করছে দেখতে পাই। বইমেলার খদ্দের টানার জন্যে এদের স্টল একেবারে ট্রান্সপারেন্ট, সব কাচের দেয়াল ঠেস দিয়ে রয়েছে,—নানান গড়নের নিতম্ব, স্তন, যোনির প্রকট ইশারা। একেবারে হাড়কাটা গলি, এইসব মলাটে দেখিয়ে পকেট কাটার আদিম আয়োজন। সাহিত্যের ভড়ং করে এদের হাফ-গেরস্তপনা। বইমেলার আগে আগে এদের বিজ্ঞাপনে খদ্দের ডাকা শুরু হয়। সে কী ভাষা! দুই সাহিত্যিকের নামে একটা জোক্স্ বাজারে ছাড়া আছে, একজন প্রবীণ, আরেকজন যুবক। প্রবীণ সাহিত্যিকের বারান্দায় বসে গল্পগুজব চলছে। পাশেই মেয়েদের স্কুল। স্কুলের সময় তো রাস্তা দেখতে দেখতে প্রবীণ সাহিত্যিক নবীনকে বললেন—বুঝলে, এখন এই বয়সেও এসব দেখলে কান গরম হয়ে ওঠে। শুনে অবাক হয়ে নবীনটি বললেন—ও, আপনি বুঝি 'ওটা'কে কান বলেন? তা, এইসব পাবলিষাঁড়দের জিজ্ঞেস করা দরকার তারা 'ওটা'-কেই বই মনে করে কি না। বেশ কয়েক বছর আগে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন—সেখানে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবসাসর্বস্ব এক প্রকাশককে বলেছিলেন, তাহলে আর 'প্রকাশক' নয়, এখন থেকে আপনাকে 'বইওলা' বলব। তো, এদের কী বলব—'বাঈওলা'? টিভিতে হিন্দি সিনেমায় যখন নায়ক-নায়িকার নাচ দেখি তখন ওদের কোমর ও নিতম্বের উপর্যুপরি ওঠানামা দেখে মনে হয় এর চেয়ে এরা প্যান্টের জিপার খুলে আর শালোয়ারের দড়ি খুলে আসল কাজটাই করুক, সেটা কম অশ্লীল। এইসব পাবলিষাঁড়দেরও বলতে ইচ্ছে করে—অত ঘোরপ্যাঁচে না গিয়ে হলুদ সেলোফেনে মুড়েই না হয় আপনাদের ছাপা Sex বিক্রি করুন আর বইমেলায় ওইসব বইয়ের সঙ্গে ফ্রি দিন 'শিলাজিত' 'মদনানন্দ মোদক', 'ফর্টি প্লাস' বা 'পৌরুষ জীবন'-এর ক্যাপসুল।

—স্বামী কমলানন্দ অবধূত

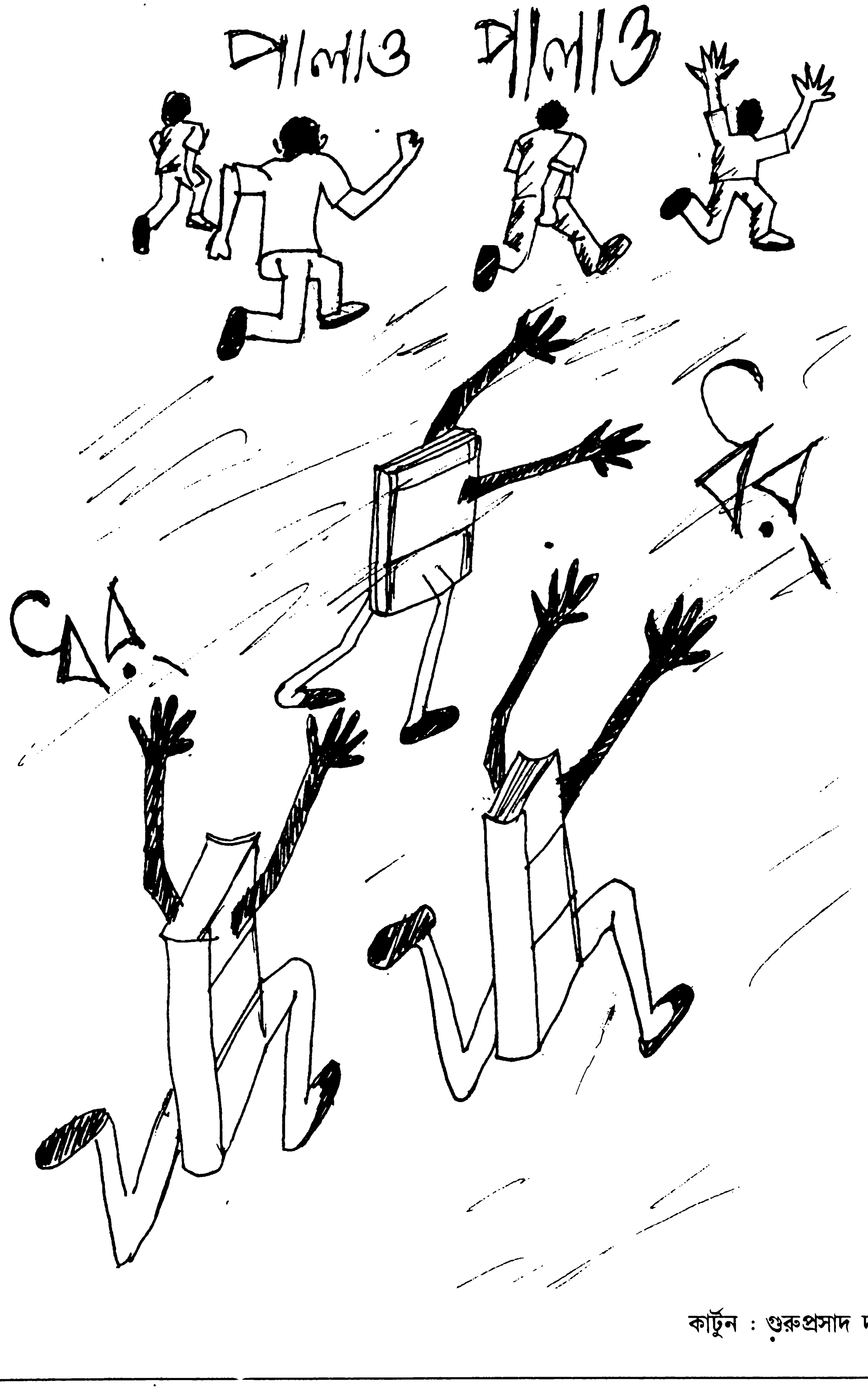

কার্টুন : গুরুপ্রসাদ দাস

পরচড়চা-পড়

শ্রী দিগম্বর বস্ত্রওয়ালা ও টিপ্পনী দেবীর যুগলফন্দি

।। শ্রী দিগম্বরের প্রণাম।।
ওঁ নমো পরচর্চাদেবায় পত্রপাঠহিতায় চ।
সুমুন্ধিতায় উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
ধাপ্পা দেয়ং ধাপ্পা পায়ং লাপাত্তা ঢপসম্ভব।
ত্রাহি ঢং সুন্দরীবক্ষ বামচক্ষু মারো হরিঃ।।

।। টিপ্পনী দেবীর প্রণাম।।
Kiss নাও বাসুদেবায় আকাদেমি নন্দনে চ।
অশেষ ক্লেশ ভালোবাসায় গোবিন্দকে নমো নমঃ।
হে ডিস্কো করুণাসিন্ধো ডেনিমগন্ধ পাঞ্জাবিতে।
সাব্বাস রজনীকান্ত হৃতিক-সানি নমোহস্তুতে।।

।। শ্রীশ্রী পরচর্চার নয়ছয়োত্তর দশ নাম।।
জয় জয় কানাকানি খুরে খুরে গড়।
অর্ধচন্দ্র কর কৃপা করুণা-সাগর।।
জয় কাঁধে গোবিন্দা গো-পাল গলাগলি।
শ্রীধাঁধার কালোজিরে মাকুন্দ-স্নবারি।।
পরচর্চা বিনে রে (ভাই) পরনিন্দা বিনে।
বিফলে পাঠকজন্ম যায় দিনে দিনে।।
দিন গেল দেখে দেখে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু পরচর্চা-চরণারবিন্দে।।
পরচর্চিবার তরে সংসারে আইনু।
কে কী মনে করে ভেবে বোবাসম হইনু।।
ফলরূপ ভূমিকম্প বাড়ি ভাঙি পড়ে।
ধর্নারূপে মমতাদি মঞ্চে চোপা করে।।
পরচর্চা জন্ম নিলেন বৈঠকী উদরে।
রকে রকে দেবগণ গুলবৃষ্টি করে।।
আড্ডাদেব রাখি আইল রকের মন্দিরে।
রক 'পরে পরচর্চা কানে কানে বাড়ে।।
দুর্বলেরা রাখে নাম 'প্রভু যাহা করো'।।
শ্রীসুবোধ নাম রাখে 'মরীচিকা সেন'।
'মল্লিকা প্রতিবাদী' ফ্যানেরা বললেন।।
চান্স পেয়ে নাম রাখে 'আনন্দ-ললনা'।।
'প্রতিষ্ঠান' নাম রাখে যে চান্স পেল না।।
কফিহৌস নাম রাখে 'সারমেয়ঘর'।
কাটাকাটি লাঠালাঠি নিত্য পরস্পর।।
মিশ্রজি বলে 'শুধু লিটম্যাগে লিখি'।
কোঁচা নেড়ে মাদলজি হাসে ফিকি ফিকি।।
লিটম্যাগ রাখিল নাম আহা: 'বড় বাড়ি'।
শীর্ষবিন্দু হেসে বলে, 'বছর বছর পারি।।

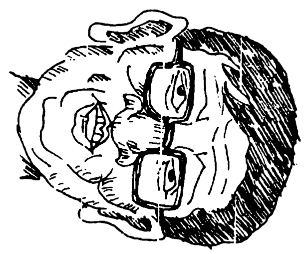

বছরে যমজ ছাড়ি, ফাঁক পেলে তিন।'
তাই শুনে শ্রীসরেস ফুঁড়িলেন পিন।।
বেলুন হেসেই খুন, পিন গেল বেঁকে।
শ্রীসরেস ধ্যানে বসে সেই দৃশ্য দেখে।।
ধ্যানে খুশি হয়ে দেখা দিলেন নির্ভীক।
শ্রীসরেস কেঁদে বলে, 'ধিক মোরে ধিক্' ।।
খুশি হয়ে নির্ভীক দিল তিন বর।
সেই বরে গাড়ি হল, হল ফ্ল্যাটঘর।।
ক্রুদ্ধদেব দূর থেকে দেখে আর ভাবে।
বাংলা ছেড়ে চলে যাব ধ্যাদ্ধেরে পাঞ্জাবে।।
সেখানে বড়ই মজা নিত্য আহুঁ আহুঁ।
তাই শুনে ঋতুদেবী ধরিলেন বাহু।।
সেই বাহুডোরে বাঁধা পড়িলেন প্রভু।
চিম্‌টি কাটার দোষ কাটিল না তবু।।
রামচিম্‌টি শ্যামচিম্‌টি যদুচিম্‌টি দেন।
হাতে তত জোর নাই, নখ হৈল পেন।।
ইতিমধ্যে আনন্দ ওঠেন পাঁচ লাখে।
পাঁচলাখ চোখ মারে পাঁচলাখ ডাকে।।
সেই ডাকে পিলপিল লেখক-লেখিকা।
কেউ খোঁজে বাঁধাবাবু কেউ খোঁজে ঠিকা।।
লেখক-লেখিকা চলে কাতারে কাতারে।
ক্রুদ্ধদেব কহে, 'দেশ ভরিল ছাতারে'।।
ছাতার জাতীয় পক্ষী যদি ছেঁড়ে শিকে।
বঙ্গের হাত ব্যথা হল লিখে লিখে।।
লিখিলে হয় না শুধু, চ্যানেলও তো চাই।
'ও মাদল জ্যাঠা, দাদু, মাদল ভাই।।
তুমি ধর্ম তুমি অর্থ তুমি কাম মোক্ষ হে।
তুমি ফার্স্ট হার্ডল গুরু আমার বই ছাপো হে'।।
বই ছাপা হল যদি কোয়ার্টার হল।
এইবার খেলে যাও সেমিফাইনালও।।
সেখানে সুনীল তুমি নীলিমায় নীল।
সুনীল-সাগরে ধায় খানা-ডোবা-বিল।।
খাল বিল নদীনালার কথা ও কাহিনী।
ঝোপ বুঝে কোপ মারার খ্যামটা বাহিনী।।
পরে আরো বর্ণিবার করিব যতন।
আজ তবে এ পর্যন্ত শ্রীচর্চাকীর্তন।।
আজ তাহলে পরচর্চা হেথা সাঙ্গ করি।
(মুখে) আঙ্গুল পুরে সিটি মেরে বলুন হরি হরি।।

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

বই নেবে-গো—বাংলা বই

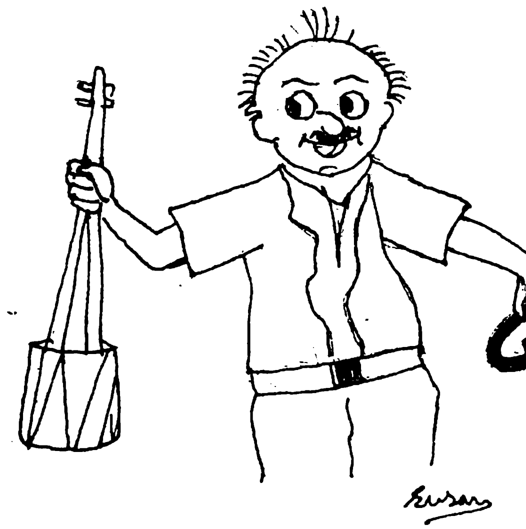

আবার আসছে কলকাতায় আরেক পার্বণ—বইমেলা। না চতুর্দশ পার্বণ নয়। এখন বাঙালির, বিশেষত কলকাতার বাঙালির পার্বণ (যদি বলা যায়) মাত্র চারটি—ক্রিসমাস, নিউইয়ার্স, রবীন্দ্র জয়ন্তী, দুর্গাপুজো, আর হ্যাঁ, বইমেলা। কলকাতার মতো বইমেলা ভারতের আর কোনো শহরে হয় না। এই গর্বে বাঙালির কৃশ বক্ষ এসপ্ল্যানেডের আকাশমুখী বেলুনের চেয়েও উচ্চকিত। কিন্তু তাতে কি বাঙালির বই-তৃষ্ণা বাড়ল? বাংলা বই কি সব মেলাগামী, মেলাপ্রেমী মানুষের উচ্ছল হাত ধরে ঘরের বুককেসে উজ্জ্বল আবাসন পেল? নাকি উচ্ছেদের নোটিস হাতে নিয়ে ম্লানমুখে নতশির মধ্যবিত্ত বাঙালিরাও অধুনা নিজেদের বাঙালিত্ব বর্জনে সদা তৎপর। উচ্চবিত্তদের কথা না বলাই বিধেয়— কেননা তাঁরা শুধুই উচ্চবিত্ত, বাঙালি নন। ভুল করে বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেই বলে ওঠেন, সরি, আই মিন...। মধ্যবিত্তও পিছিয়ে থাকবে কেন? বিশ্বায়নের যুগ এটা। অতএব পুত্র কন্যাকে মামি-ড্যাডি-পাপা-আন্টি শেখাতেই হবে। ভুলেও শেখাবেন না—সুকুমার-হেমেন্দ্রকুমার। শুনছি এখনকার কিশোর-তরুণ সম্প্রদায় ঘনাদা টেনিদার নামও নাকি জানে না। সুন্দরবাবু শুনলে নিশ্চয় বলতেন, হুম্!

সিনেমা ও টিভির কল্যাণে ফেলুদা এখনো তত বিস্মরণে যায়নি। তবে কতদিন তার পরমায়ু?

পরিচিত এক প্রকাশক বললেন, কলকাতার বইমেলায় কলকাতার বই কম বিকোয়। হাতে হাতে দেখবেন, ইংরেজি বইভরা ব্যাগ। ইংরেজি বই হাতে বা ঘরে না রাখলে বাঙালি বুকে-পিঠে নিজেকে যথেষ্ট সংস্কৃতিবান, কৃষ্টিসম্পন্ন জাহির করার স্টিকারের অভাব বোধ করে।

সবিনয়ে প্রস্তাব দেওয়াই যেতে পারত, বরং একটা 'বেনফিস'- মার্কা বিপণি খুলুন। লাইন সামলাবার জন্য বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। বলতে লজ্জা করল। প্রতিবার বেনফিসের লাইন দেখে মনে হয়েছে, আবার কি মন্বন্তর লেগেছে? নতুবা এত বুভুক্ষু মানুষ লাইনে? এখানে লাইন দেবার জন্যই বইমেলায় হাজিরা দেওয়া? কি জানি!

তুবড়ি কবি ছন্নছাড়া তুখোড় বলল, বৈরাগীদা, তুমি কেবল পাঠকদের বা মেলাভ্রমীদের দোষ ধরছ, যে কারণে কলকাতার বইমেলায় বাংলা বই দুয়োরানী-দীনতায় ভোগে, সেটা বোঝার চেষ্টা করছ না!

বৈরাগীকে শিক্ষিত করে তোলার আগ্রহে তুবড়ি-কবি বলে, নামি প্রকাশকরা বছরের পর বছর একই পশরায় দোকান সাজাচ্ছে। থোড়বড়ি মানুষ আর কত খাবে। একই লেখক-তালিকা, একই বইয়ের নানা নামে পুনর্মুদ্রণ। পাঁচটি উপন্যাস হচ্ছে ডজন উপন্যাস, সেরা গল্প ঘোমটা টেনে শত গল্প—পাঠকরা কি উজবুক? গত শতকের পঞ্চাশের দশকেও লেখকরা সরাসরি প্রকাশকের হাতে পাণ্ডুলিপি দিলেও বই ছাপা হত। এখনকার প্রকাশকরা পড়ার কষ্ট স্বীকারে অনিচ্ছুক শুধু নয়, আগাম যাচাই করতে চান, কোনো কাগজে বেরিয়ে কী অখ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করেছে। তবেই প্রকাশের বিবেচনা হলেও হতে পারে। তাতেও যে হবে, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। নতুন লেখক তো কুষ্ঠরোগীর চেয়েও অধম। কুষ্ঠ সারে, সারতে পারে। নতুন লেখক? ওরে বাব্বা!!

ছন্নছাড়া তুখোড় বলল, আমার এখন বই বের করতে অসুবিধে হয় না। নাম হয়েছে কিছুটা। গ্রামে-গঞ্জে কবিতা পড়তে গিয়ে কিছু বাণিজ্যও সেরে আসি আর পাঁচশালা যোজনার মতো মাঝেমধ্যেই একটা কোনো পুরস্কার ম্যানেজ হয়ে যায়। টাকাটা নিজেকেই দিতে হলেও পাবলিসিটি তো হয়ই। কিন্তু যাদের আমার এলেম নেই, বা এখনো ততটা নামটাম হয়নি, তাদের খুবই করুণ অবস্থা। দশ-কুড়ি বছর ধরে লেখালেখি করেও বই বের করতে পারছে না।

দশ বা কুড়ি বছর কিছু নির্ধারণ করে না। নির্ধারণ করে লেখা। সেখানেও সমস্যা—কোথায় লিখবে? পত্র-পত্রিকার সূচীপত্রে বছরের পর বছর একই নামাবলী। যেমন প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে পাঠকরাও অসহায়। মুখ বদলাবার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ মেলে না। অগত্যা অপাঠ্য ইংরেজি বইই সই। মুখ বদলও হল, সংস্কৃতির জয়ঢাকও বাজল। 'পেস্টিজ'ও বাড়ল। নয়ত বেনফিস তো আছেই।

জানা ছিল না, কখনো খেয়াল করিনি। তুবড়ি কবিই জানাল, প্রতি বছর ভোজন-বিনোদনের স্টল বইমেলায় বাড়ছে। সেখানেও বিশ্বায়নের ফুরফুরে মেজাজি আয়োজন। হটডগ, হ্যামবার্গার, আইসক্রিম, প্যাসি, প্যাস্ট্রি তো বটেই, অধুনা ক্রেজ পিৎজার রমরমা এবারের বিশেষ আকর্ষণ। এক

বেওসায়ীই—ভয়ঙ্কর বুকলাভার, মানিমেকার, তিন কি চারটে স্টলের বরাত পেয়েছে। এর আবার নাকি নিলাম হয়। যে দর বেশি হাঁকবে তারই দখলে ''দ্রৌপদী''। অর্থভোগ্যা ধরিত্রী। তবে দুর্জনে বলে, বিশেষ কর্মকর্তাদের বিশেষ 'খুশ' করলে সফলতা অনায়াসে। আর বেওসায়ীরা তো 'খুশ' করার কুশলতার জন্য গণতান্ত্রিক জ্ঞানপীঠলব্ধ। আগামীদিনে শুধু রসনা-মেলার রমরমার জন্যই চীন বা ইতালি কি মেক্সিকো থিম কান্ট্রি হতে পারে। চীন বা ইতালির বিভিন্ন রকম রসনা নিরসনের প্রদর্শনীর কথা ভাবলেই মুখে বুকে পাকস্থলী মায় ক্ষুদ্রবৃহৎ অন্ত্রেও কিরকম সড়সড়ে হুটোপুটি—ক্ষমতাধর দলের ব্রিগেড-উৎসবের মতোই!

কেবল একটা প্রশ্ন জাগে—'বইমেলা' নামের আদিখ্যেতা রাখার দরকার কি? বদলে কাছাখোলা মেলা বললে কি খুব ভুল বা দুষণীয়? লেখকরা কাছা খুলে ছুটছে প্রকাশকের পেছনে, প্রকাশক ছুটছে নামি-দামি লেখকের পেছনে—ঠিক যেমন গ্রামের রাখাল ধামা হাতে গরুর পেছনে দৌড়য় গোবরের লোভে। আর মামি-ড্যাডি নামক কিম্ভূত সম্প্রদায় টিনটিন বা বার্বি-মার্কা হতচালিতদের নিয়ে হত্যে দিচ্ছে পিৎজা-কিওস্কে বা বেনফিসের অজগর-পুচ্ছে।

—বইমেলায় যাবেন তো? কবি প্রশ্ন রাখে।

যাব নিশ্চয়। স্মৃতির গম্বুজের মতো পুরনো হারানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার লোভে। আর সুবর্ণরেখায় দুর্লভ মাণিকের মতো সুদুর্লভ কোনো বিস্ময়কর গ্রন্থের আবিষ্কার সম্ভাবনায়। আকাঙ্খিত পার্বণীর প্রত্যাশায়।

কবে দেখব সেই ফেরিওয়ালা, যে ডেকে যাবে—'বই নেবে গো, বই—বাংলা বই—'.....

N. C. DAW & Co.

Gun Makers

Since 1835

9, B. B. D. BAG (EAST)
KOLKATA-700 001
220-6643/4317

পথঘাটের কিস্‌সা

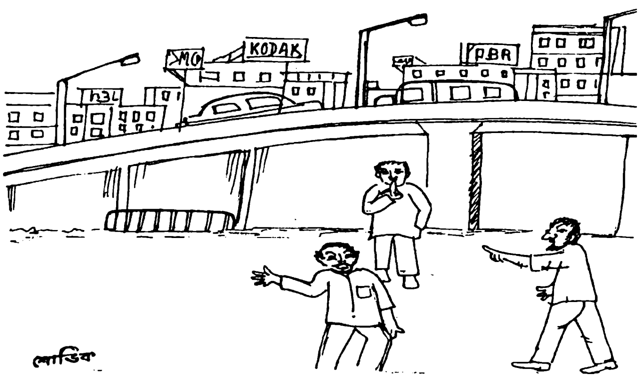

দলাদলি

গড়িয়াহাটার মোড়, দুপুর ১২টা। রাস্তার মোড়ের চার কোণে জটলা, ভিড়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, হকার দর্শন। রাস্তা পারাপার চলছে। উত্তর দক্ষিণের গাড়িগুলো সাঁই সাঁই করে নবনির্মিত ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে ছুটছে। রাস্তায় তাই গাড়ি কম। যানজটের ঝামেলাও নেই, দূরে দুই ট্রাফিক পুলিশ থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে। রাস্তা পারাপার তাই এখন সহজে করছে পথচারীরা। হকার আগের মতোই আছে, কেবল ফুটপাতের ওপর সারি সারি চালাঘরগুলো ভাঙা পড়েছে। রাস্তার ওপর ভবঘুরেদের তাণ্ডব কিছুটা কমছে। তাই গড়িয়াহাট এখন আগের থেকে পরিষ্কার। এপার থেকে ওপারের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ফ্লাইওভারের নিচে নির্মাণকার্য এখনও চলছে। কয়েকজন লোক ছোট ছোট কাগজের হ্যাণ্ডবিল বিলি করছে। টুকরো কাগজ কেউ নিচ্ছে কেউ আবার মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। এক কথায় গড়িয়াহাটার মোড় কর্মব্যস্ত, গতিশীল। উত্তরপূর্ব কোণে যশোদা ভবনের নিচে ফ্লাইওভারের দিকে তাকিয়ে সিঙ্গাপুরি কলা খেতে খেতে একজন ভদ্রলোক তার সঙ্গীকে বলছে—গড়িয়াহাটের চরিত্রই বদলে দিয়েছে ফ্লাইওভারটা। প্রায় তিন তলার সমান উঁচু। রাতের দৃশ্য আরও সুন্দর, আলোয় ঝলমল করে।

জনৈক পথচারী—ফ্লাইওভার এত উঁচু যে চোখ কপালে তুলে দেখতে হয়। এখনই তো ফাটল ধরে গেছে। কোনদিন ভেঙে মাথায় পড়বে তখন বুঝবে ওরা। বাসে উঠতে গেলে হয় গোলপার্ক যাও নয়ত ঘুরপাক খাও।

জনৈক হকার—হ্যাঁ, সবই দুর্বিপাক।

—থামো হে ছোকরা, মোড় থেকে তো বাসে ওঠার উপায় নেই। ফ্লাইওভার তৈরি নয় তো জনসাধারণের অর্থের অপচয়।

হকার—দাদা আপনি কোন দলের?

—কেন? দলাদলির কি হল? যা সত্যি তাই বলছি। যানজট কমেনি, বরং বেড়েছে।

—দাদা চশমাটা বদলান। পুরনো হয়ে গেছে।

—আপনি কোন দলের শুনি?

—ইস্টবেঙ্গলের।

—দূর বাঙাল।

কলা হাতে ভদ্রলোক—আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? আপনারা তো রোজই পার্কগুলো ভাঙেন আর গড়েন। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে টিউবওয়েল বসাচ্ছেন, জঞ্জাল জমান, ফুটের ওপর ক্লাব তৈরি করে মস্তান তোষণ করেন। আপনাদের বুঝতে বাকি নেই।

হকার—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। চোরের মায়ের বড় গলা। লজ্জা থাকে তো পালা।

—বরুণ ঘোষ

মাকড়সা-আরশোলা

রবিবার সকালে পড়তে যাচ্ছি ট্রেনে করে। হঠাৎ আমার পাশের কামরা থেকে চিল-চিৎকার। সঙ্গে ব্যাপক আর্তনাদ। কি হল চমকে দেখি আমার আশে-পাশে সকলেই বোঝার চেষ্টা করছে কি ঘটেছে। গাড়ি থেমে গেল স্টেশনে। বিস্তর লোক চলাচল করছে। অনেকেই বলাবলি করছে, ‘‘স্ট্রেচার আন না একটা, ডাক্তার ডাক না।’’ স্টেশনে নেমে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা। প্রচুর ভিড়। তবুও সেই ভিড় ঠেলে দেখি এক ভদ্রলোক শুয়ে রয়েছেন। কেউ কেউ হাওয়া করছে। একজনকে জিজ্ঞেস করি, ব্যাপারটা কি বলুন তো? কি হয়েছে কি? লোকটি যা বলল তা শুনে আমি হতবাক। ‘‘একটা ছোট্ট পেটমোটা মাকড়সা নিজের জাল বুনতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ট্রেনের ঝাঁকানিতে ভদ্রলোকটির সামনে জেম্‌স বণ্ডের মতো ঝুলে থেকে একটা দড়ির সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। তাই দেখে ভদ্রলোক ফিট্ হয়ে গেছেন।’’ পাশের এক ভদ্রমহিলা ঝগড়ার ভঙ্গি করে বললেন, ‘‘কীরকম কাপুরুষ বলুন তো, একটা মাকড়সা দেখেই এই অবস্থা! এরা পুরুষের নামের কলঙ্ক।’’ আর তখনই কোথা থেকে ফরফর করে উড়ে এক আরশোলা একেবারে মহিলার নাকের ডগায়। ‘ওঁয়াউ’ বলে চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে ভদ্রমহিলা ধপাস্। একেবারে মাকড়সাবাবুর ভুঁড়ির ওপরে।

—কাকলি সরকার

বিচিত্রা

দিব্যলোচন কলমধারী

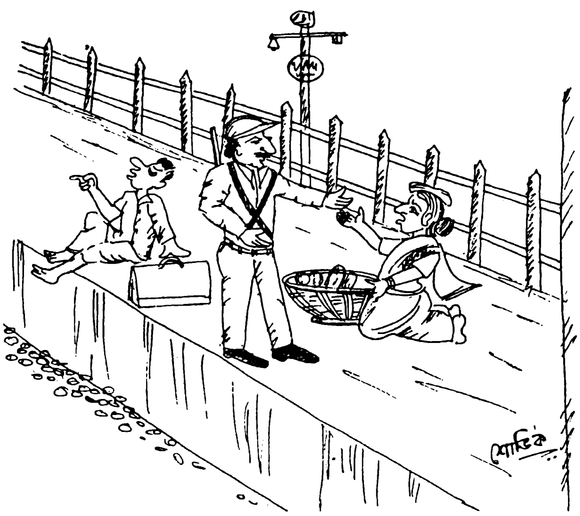

আলুটা পটলটা বেচে পরাণ-হারান পদি-সতীরা বারোয়ারী লোকালে বাড়ি ফিরছে। খালি ঝুড়িগুলো সোফা-কাম-বেড। ধানি বিড়িতে সুখটান চলছে। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল রেলের রাজা রাবণ। রেলপুলিশ।

—কে রে, বের কর।

—বাবু গো, আজ আর সব্জি বাঁচেনি। এই নাও বিড়ি। গোটা বাণ্ডিলটাই রাখো। কাল আর ভুল হবেনি গো।

—ঠিক আছে, আজকের দিনটা চালিয়ে নেব। কাল কিন্তু শ্যাওলা রঙের গোটা কুড়ি পটল হাতে দিয়ে যাবি। নইলে লক-আপ হবি। রেলের কত ক্ষতি! শাজাহানের মতো আসা-যাওয়া করিস। যেন জলে চলছে। দে, আর. ডি. এক্স. দে। বিড়ি ধরাব কি করে?

—এই যে বাবু—ম্যাচেস্। বাবুগো, গাড়িতে আর ধূমপান চলবেনি গো। মন্ত্রী কাগজে কয়েছে।

—পটল বানান করতে পটল তুলিস, তোর আবার কাগজ! জানিস, মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চেয়েছে এ ব্যাপারে? এবার রাষ্ট্রপতি দেখবে।

—বলো কি বাবু! তোমাদের তবু আলু-পটল দিয়ে ম্যানেজ করি। তেনারে কি দি?

—তোদের চিন্তা কি, আমরা তো থাকবই—।

—পতি ঘরে ঢুকলে ভাতার তখন ঠাকুরপো হয়ে যায় গো বাবু। বড় চিন্তার কথা গো বাবু।

* * *

সোনালি সেন কোর্টে যাবার জন্যে খেয়ে দেয়ে তৈরি। সঙ্গে যাবে বাবা যতীন সেন। মা বলল, বাবাকে একটু সাবধানে রাখিস মা।

—কেন মা? হারিয়ে যাবে?

—না, তা নয়।

—তবে কি মা?

—অফিসে তোর বাবা ছাড়া সবাই ইউনিয়নের লোক। তাই ক্যাশ চুরি হলেই তোর বাবা বাঁধা আসামি। তিনবার চিৎপুর লক-আপ হয়ে গেছে। এবার হলে বলেছে সত্যিকারের একটা খুন করে জেলে যাবে। পুলিশ দেখলে মাথার ঠিক থাকে না। কোর্টে গিয়ে যতীন পাগলা জজ খুন করে না বসে রে!

—না মা, আমি বাবার হাত ধরে থাকব। তুমি চিন্তা কোরো না।

—একদম হাত ছাড়িস না মা। চোর-ডাকাতরা নিয়ম করে কোর্টে যায়। আর একদল যায়। সবাই সন্দেহভাজন। চালাঘরের তলায় চালাচালি করে সারাক্ষণ। থেকে থেকে তারিখ আনতে চলে যাচ্ছে। সক্কেলকে দিচ্ছে—উফ্ কী ফ্যান্টাস্টিক্ তারিখ পেয়েছেন মশাই! রবিঠাকুরের জন্মদিন! ঐ দিন ওরা 'অ্যাপিয়ার' না হলেই হাওড়া ব্রীজ আপনার!

ওরে, কার্ল মার্কস শুধু বিরোধী আসনের কথা ভেবে তৈরি করেছিল বামপন্থা। কে জানত পঁচিশ বছর শাসন করতে হবে? ধন ছাড়া শাসন হয়? হাল্লা রাজা? গুপী আর বাঘা ছাড়া কেউ পুঁছবে না।

—বুঝেছি মা। ওরা কালো কোটধারী।

—কালো কোটধারীরা আবার দু'জাতের। 'অনার' আর 'ইয়োর অনার'। এক একটা ঘরে এক একটা অনার। আর তাকে ঘিরে একদল ইয়োর অনার। কত ব্ল্যাকার!

—তুমি কিছু চিন্তা কোরো না মা। আমরা যাব আর আসব। কোর্ট খাতা চেয়ে পাঠালেই চল্লিশ যোগ হয়ে যায়। কাউন্সিল বলে, আমরা দুঃখিত ইয়োর অনার। খাতা দেখার লোকেদের উপরি বন্ধ হওয়ায় ওরা ষড়যন্ত্র করছে। তার ওপর জনযোদ্ধা ঢুকে পড়েছে। আমরা সাবধান হচ্ছি। এখন এটা খুব চল হয়েছে মা। এখন মেধাবীরা কোর্ট থেকে নম্বর আনছে।

* * *

স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন হাসপাতালে।

—দিয়ে দে বাবা, দিয়ে দে। ওরে ওটা জেলানেতার বাচ্চা। দিয়ে দে।

—স্যার, এর মধ্যে তিন খেপ মাল গেছে বিহার, ইউ পি আর নেপালে। খুঁজে পাওয়া মুশকিল। দু'দিনের বাচ্চা সব এক দেখতে। ময়দার তাল। লুচি হবে কি পরোটা হবে নাকি সিঙাড়া হবে তা বোঝা দায়।

—এই নে বাবা। জেলানেতা আর চোদ্দ পুরুষের ছবি। মিলিয়ে দেখ বাবা। সামনে ইলেকশন। কি বিপদ!

—এর মধ্যে স্যার, আরব চলে যেতে পারে।

—দিল্লিকে বলে পাশপোর্ট বন্ধ করিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। এই যে সেক্রেটারি—

—আজ্ঞে দিল্লিতে বিরোধী সরকার। শুনেও শুনবে না।

—বুঝেছি, আপনি ওদের সাপোর্টার। কাল থেকে অফিসে আসবেন না। গর্ভরোধক গুলি নিয়ে গ্রামে যাবেন।

—আজ্ঞে গতমাসেই ঐ কর্মসূচী আপনি নিজে সেরে এসেছেন। গুলি আর নেই।

—পোস্তা থেকে চিনেবাদাম কিনে নিয়ে যান। বলবেন উন্নত মানের মাল। বাড়িসুদ্ধু সবাই খেতে পারে। অতিথি এলে দেয়া যেতে পারে। পুজোর পেসাদ বলে চলতে পারে। একটু নুন দিয়ে খেতে পারলে গর্ভরোধক ছাড়া সারাদিন আর কিছু খেতে লাগবে না। যান—। হ্যাঁ বাবা, তোদের যা বলছিলাম....

—স্যার, বাচ্চাটার নাম যদি বলেন—

—হারাধন। কিন্তু দু'দিনের বাচ্চা কি নাম বলতে পারে?

—গোডাউনে গিয়ে 'হারাধন' 'হারাধন' বলে চ্যাঁচাব স্যার?

—সবকটা কেঁদে উঠবে রে। সবকটাই তো হারাধন। অন্য উপায় ভাব রে। অমন লড়াকু নেতা পার্টি-অফিসে বসে কাঁদছে।

—স্যার, মার্কসবাদে কান্নাকাটি চলে? কেমন বুর্জোয়া নাম রেখেছে, হারাধন। মার্কসবাদে ধন চলে?

—ওরে, কার্ল মার্কস শুধু বিরোধী আসনের কথা ভেবে তৈরি করেছিল বামপন্থা। কে জানত পঁচিশ বছর শাসন করতে হবে? ধন ছাড়া শাসন হয়? হাল্লা রাজা? গুপী আর বাঘা ছাড়া কেউ পুঁছবে না। তাই এখন ধনরত্ন চলে রে। খালিগায়ে ঘুরত বলেই গান্ধীজি গুলি খেয়েছিল। নাথুরাম দারিদ্র্য দেখতে পারত না। নেহেরুও তাই। শাসক হতে গেলে কোট চাই। কোটে আবার গোলাপ চাই। গরম পড়লেই ইউরোপ যাওয়া চাই। আলিপুরের বাঘ দেখবি বেশি এধার-ওধার করে না। সুন্দরবনের বাঘ খেটে খেটে মরল। আজকাল মানুষ ধরে ধরে বাঘের মাংস খায়। যাক, কাজের কথা বল বাবা।

—স্যার একটা বদলি দিয়ে রাখছি। ম্যাড্রাসি মাল। আড়াই বছর। গায়ের রঙটা একটু চাপা হবে।

—জানতে পেরে যাবে রে।

—কেউ জানতে পারবে না স্যার। ধোপার কাছে জামা হারালে আর জোর গলায় কেউ বলতে পারে, এটাই আমার? কেশপুরে কি হয়েছিল, কেউ জানতে পেরেছে? অজিতবাবু কোন দলে, কেউ জানতে পেরেছে? শিশুপাচার চক্রের পাণ্ডা কে, কেউ জানতে পেরেছে?

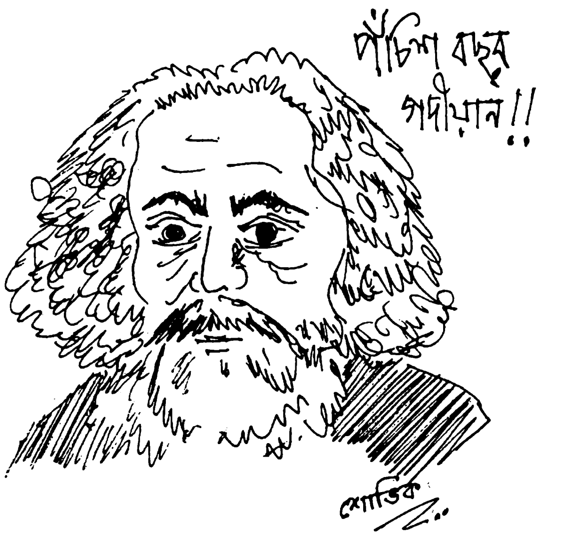

ট্যারা চোখে

তোমার নাম কি?

—মুজিবুল।

—বাবার নাম ?

—হাজিবুল।

—ঠাকুর্দার নাম?

—রেজাউল।

—তার বাবার নাম?

—জানি না, হুজুর। ও শালা হিন্দু ছিল।

(কৃতজ্ঞতা : অশোক মিত্র, আপিলা চাপিলা)

—প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

গভেট

প্রবীর মণ্ডল

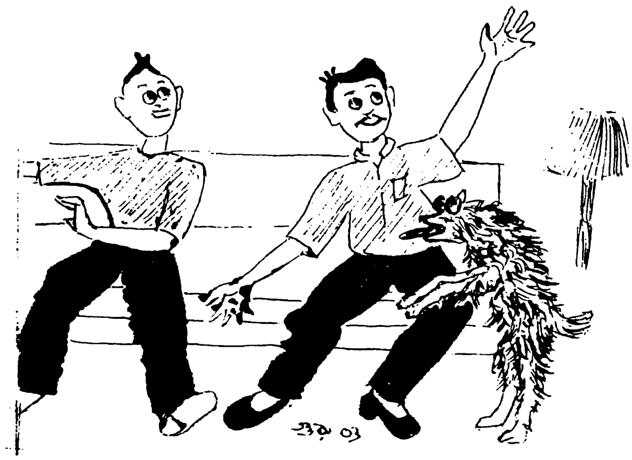

না, পত্রিকাটির সম্পাদক আমি নই। এমনকি পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীরও আমি কেউ নই। পত্রিকার সম্পাদক স্রেফ আমার বন্ধু এবং বন্ধুর প্রতি প্রগাঢ় আসক্তির কারণে সম্প্রতি পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্যে বন্ধুর সঙ্গে এক এম এল এ বাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম।

এম এল এ বাবু তাঁর বৈঠকখানা ঘরের সোফা দেখিয়ে আমাদের বসতে বললেন। এবং বললেন, একটু পরে আসছি। আমরা দুগ্ধ ফেননিভ সেই সোফাতে বসলাম। বসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এক অন্যরকম আরাম অনুভব করলাম। কারণ, এর আগে এমন গদিতে আমি বসিনি। যেন স্বর্গীয় সুখ। যদিও আমি কখনো স্বর্গে যাইনি এবং কোনোদিন স্বর্গে যেতে পারব, এমনটা আমার বিশ্বাসও হয় না। দেবতাদের সঙ্গে আমার বড্ড আড়ি।

স্বর্গীয় আরাম নয়, বরং আমার দুঃখের কথা বলাই ভালো। সেই 'অন্যরকম' আরাম আমার কপালে বেশিক্ষণ জুটল না। কুঁই কুঁই করতে করতে একটি পুঁচকে কুকুর আমাদের দু'জনের কাছে আসল এবং বন্ধুর সঙ্গে নয়, কুকুরটি আমার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইল। যেন আমি ওনার ভালোবাসার পাত্র। আমাকে কৃষ্ণ ভেবে রাধিকার মতো উনি আমার কাছে প্রেম নিবেদন করতে এয়েচেন। দিবাকালীন অভিসার। যেন এম এল এ বাবুর বৈঠকখানা তাঁর কাছে—

মথুরা-বৃন্দাবন অথবা ভিক্টোরিয়া নন্দন।

ইতিমধ্যে উনি আমার পা চাটতে শুরু করেছেন। অথচ উনি জানেন না, কুকুর দেখলেই আমার শরীরের সমস্ত রাগ গরম তেলের মতো টগবগ করে ফুটতে থাকে। ইতিমধ্যে পা ছেড়ে উনি আমার হাতদুটিও চাটতে শুরু করেছেন। অথচ উনি জানেন না, ইতিপূর্বে আমি কুকুর বিষয়ক গদ্যে, কুকুর সম্পর্কে আমার আক্ষেপ ও তীব্র রাগের কথা লিখেছি। তবুও উনি এম এল এ বাবুর বৈঠকখানাকে মথুরা-বৃন্দাবন বানিয়েই ছাড়লেন। ইচ্ছে হল উদোম ক্যালাই। তবুও উপায় নেই, বিজ্ঞাপনের কথা যে মাথায় আছে। চুরি করে ওনার কানদুটো জোরে জোরে মলে দিলাম। তবুও কেন জানি না, উনি রাগলেন না। কুঁই-কুঁই করে এমনভাবে ডাকলেন, যেন ওনার কানে আমার হাতের স্পর্শে, ওনার পুলক উদ্রেক হয়েছে।

এমন সময় এম এল এ বাবু আমাদের কাছে আসলেন এবং আমি কুকুর সম্পর্কে আমার বিরক্তির কথা এম এল এ বাবুকে জানালাম। এম এল এ বাবু জীনা-জীনা করে চার পাঁচবার চিৎকার করে বললেন, জীনা, গভেটকে নিয়ে যাও।

'গভেট'? শব্দটি শুনে বিস্ময়ে চোখ বুজলাম এবং বললাম (মনে-মনে), এম এল এ বাবুরাও খিস্তি মারে! কিন্তু কাকে 'গভেট' বললেন, বুঝলাম না। আমরা দু'জন কি....। কিন্তু জীনাই বা কে? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। এম এল এ বাবু বললেন, জীনা আমার বারো বছরের একমাত্র মেয়ে এবং গভেট আমার কুকুরের নাম।

পুঁচকে গভেট কিছুতেই আমার পাছু ছাড়লেন না।

এমন সময় দোতলা থেকে বারো বছরের জীনা 'গভেট-গভেট' করে পুঁচকে কুকুরটিকে ডাকে। আমিও জীনার সুরে সুর মিলিয়ে বললাম, গভেট যাও, তোমার দিদি তোমাকে ডাকছে।

কুকুরটি ওপরে উঠে গেল।

আমার সম্পাদক-বন্ধু এম এল এ বাবুর কাছে বিজ্ঞাপনের কথা বলল।

তিনি অর্থাৎ এম এল এ বাবু বিস্ময় ও বিরক্তির সুরে বললেন, বিজ্ঞাপন? না ভাই, বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন, তোমরা এখন...

আমরা দু'জনে উঠলাম।

আমার মাথার মধ্যে একটাই শব্দের ছোটাছুটি—গভেট!

লেখক-লেখিকারা শুনুন

পত্রপাঠ অখ্যাত লেখকদের ভালো লেখাই চায়। শুধু দয়া করে লেখার সময় পত্রপাঠ-এর চরিত্রটি (কিংবা দুশ্চরিত্র) মনে রাখবেন। ফুলস্কেপ পাতার একদিকে লিখুন। মার্জিন রাখুন।

বইমেলা ২০০৩, স্টল নং : এস-২৯৪

একটি ধোঁয়াটে গল্প

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

সেদিন সকালে নিজের ঘরে তক্তপোষে বসে সিগারেট ধরিয়ে টান মারছিলাম। সিগারেটে টান মারলেই ধোঁয়া বেরোয়। আমি সেই ধোঁয়াটাকে জানালা গলিয়ে বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু চেষ্টাই সার। বেয়াদব ধোঁয়া, আমার ইচ্ছেমতো চলতে তার বয়েই গেছে। আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি, ফুঁয়ের শক্তি, এমনকি প্রচণ্ড থাপ্পড়ের শক্তি সবকিছুকে চরম অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে সে সোজা ছাদের দিকে চলে যাচ্ছিল, সরি, উড়ে যাচ্ছিল। আর কিছুটা যাবার পরেই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছিল।

ধোঁয়ার বেয়াদবিতে প্রথমটা খুব রাগ হয়ে গেল। তারপর কিছু করতে না পারায় দুঃখে হতাশ হয়ে পড়লাম। তারপরেই মনের মধ্যে একটা দার্শনিক ভাবের উদয় হল। ভ্যানিশ হয়ে যাবার পর ধোঁয়াটা কি জানি জানলা গলেই বেরিয়ে গেছে। তার মানে লুকোচুরি খেলা। আমার মনোমতো কাজটাই হয়েছে, তবে আমার অলক্ষ্যে। আহা, কে তুমি আমারে ডাকো, অলসে লুকায়ে থাকো। কোটেশনটা মোটেই মানানসই হল না। কিন্তু এর চাইতে কোনো যুৎসই কোটেশন এই মুহূর্তে আমার মাথায় আসছে না।

শ্রীমান মদনমোহন আমার জানের বন্ধু, ঘরে ঢুকেই হুঙ্কার ছাড়ল, পেনো, তুই সিগারেট ধরেছিস্? ব্যস, তোর হয়ে গেল। এরপর বন্ধুটি আমার মুখের দিকে এমনিভাবে চেয়ে রইল যেন আমার ওই হয়ে যাওয়াটা ও ওইখানেই দেখতে পাচ্ছে।

ঘাবড়ে গেলাম। খুবই স্বাভাবিক। এরকম একটা বেমক্কা কথা শুনলে স্বয়ং অর্জুনও ঘাবড়ে যেত। বললাম, কী হয়ে গেল?

—তুই আর হতে পারবি না।

—কী হতে পারব না? একবার তো মায়ের পেট থেকে হয়েইছি। আবার হতে যাব কোন দুঃখে?

—না না, সে হবার কথা হচ্ছে না। এ অনেক বড় হবার কথা।

—বড়ও তো আমি রোজ একদিন করে হচ্ছি। আমার বড় হওয়া ঠেকায় কে?

—কিছুই বুঝিস না। তুই একটা হতভাগা।

—সে আর বলতে। আমি যে হতভাগা সেটা তো নিজেই বুঝতে পারছি। দ্যাখ্ না, তখন থেকে লড়ে যাচ্ছি, সিগারেটের ধোঁয়াটাকে কিছুতেই জানালা দিয়ে গলাতে পারছি না। শুধুই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আমারই সিগারেট, আমারই ধোঁয়া, আমারই ফুসফুসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমারই সঙ্গে বেয়াদবি!

বলতে বলতেই মদনের মুখ লক্ষ্য করে কিছুটা ধোঁয়া ছেড়ে দিলাম। ও হাতের চেটো দিয়ে বাতাস করে ধোঁয়াটাকে ওর নাকের সামনে থেকে

উড়িয়ে দিল। ওর ওরকম ভীষণভাবে সিম্পল হারমনিক মোশনের চেটো নাড়ানো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। ওর একটাও এসে যদি আমার গালের ওপরে আছড়ে পড়ে তবে এখানেই কাৎ হয়ে পড়ে যাব। ভয়ে ভয়ে সরে বসলাম। আর সরে বসেই লক্ষ্য করলাম, মদনার থাপ্পড় খেয়ে সিগারেটের ধোঁয়াটা গুটি গুটি জানালার দিকে এগোচ্ছে।

বাপ্‌রে! বন্ধুর আমার থাপ্পড়ের এলেম আছে বলতে হবে। আর হবে না-ই বা কেন? মদনমোহনের থাপ্পড় বলে কথা! ওই থাপ্পড় খেয়ে কংস পর্যন্ত কাৎ হয়ে পড়েছিল, ধোঁয়া তো কোন তুচ্ছস্য তুচ্ছ।

এইবার আমার মাথায় আর একটা দার্শনিক চিন্তা এসে গেল। পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা অনেক ছোটখাটো জিনিস থেকে অনেক বড় বড় জিনিস আবিষ্কার করেছে। গ্যালিলিও বাচ্চাবেলায় মায়ের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে ছাদ থেকে চেনে ঝোলানো বাতিদানটাকে ক্রমাগত দুলতে দেখে পেণ্ডুলামের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল। নিউটন গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিল। জেম্‌স ওয়াট ফুটন্ত জলের বাষ্পে কেটলির ঢাকনার নড়াচড়া দেখে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিল। গ্যালভানি একটা তারের ছোঁয়া লেগে একটা ঝুলন্ত মরা ব্যাঙের ছটফটানি দেখে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছিল। এই রকম আরো অনেকে অনেককিছু দেখে অনেককিছু আবিষ্কার করেছিল। তাহলে আমিই বা পিছিয়ে থাকব কেন? মদনমোহনের থাপ্পড় খেয়ে ধোঁয়ার জানালা-গমন দেখে আমিও কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারি। কী আবিষ্কার করা যেতে পারে, সেটাই ভাবতে লাগলাম। কিন্তু অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও সেরকম কিছুই মাথায় এল না। এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা মানেই অপদার্থতা। নিজের অপদার্থতার কথা চিন্তা করে মনে মনে খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম।

বিষণ্ণতাটা কেটে গেল বন্ধুর দাবড়ানি খেয়ে। শুনতে পেলাম ও আমাকে গাল দিচ্ছে—ইডিয়ট!

—সেকথা কি আর বলতে! আমি একটা ইডিয়ট ছাড়া আর কী? এই দ্যাখ না এতক্ষণ ধরে লড়ে যাচ্ছি তবু যুৎসই একটা আবিষ্কারের কথা মাথাতেই আসছে না। ইডিয়ট না হলে এতক্ষণে আমি ঠিক একটা-কিছু আবিষ্কার করে ফেলতাম। বন্ধুর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি পুরো একমত হয়ে গেলাম।

কাউকে ইডিয়ট বললে সে একমত হয়ে যায়, পৃথিবীতে বোধহয় এই প্রথম হল। আর এটাই কি জানি, হয়ত আমার সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা দিয়ে আমি বিখ্যাত হব।

আবিষ্কারের গন্ধ পেয়ে এতক্ষণের বিষণ্ণতাটা কেটে গিয়ে মনের মধ্যে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব চাগাড় দিয়ে উঠল। খুশির ঠেলায় বন্ধুকে এককাপ চা খাওয়ানোর কথা ভাবলাম আর মুখ ফুটে সেটা প্রায় বলেও ফেলছিলাম। কিন্তু বন্ধুর পরের হুঙ্কারে মুখের কথা মুখেই ঢুকে গেল।।

—তোর দ্বারা আর কিস্যু হবে না। যা-ও বা একটু আশা ছিল সেটাও গেল।

—আমার সম্বন্ধে তোর কী আশা ছিল? আর সেটা গেলই বা কেন?

—তুই কোনোদিন ভারতের রাষ্ট্রপতি হতে পারবি না।

সর্বনাশ! বন্ধু বলে কি? একেবারে রাষ্ট্রপতি? ও যে এতদিন আমার সম্বন্ধে এরকম একটা আশা পুষে রেখেছিল, সেটা তো ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন টের পাইনি! জীবনে ওর মুখে অনেকরকম বিশেষণে ভূষিত হয়েছি। রামপাঁটা উজবুক হাঁদাকান্ত ইডিয়ট এইরকম আরো অনেক কিছু। কিন্তু আমাকে কোনোদিন রাষ্ট্রপতি বলে গাল দিতে তো শুনিনি। তাহলে কি ওই মোক্ষম গালটা ও আজকের জন্যে তুলে রেখে দিয়েছিল? কিন্তু তাই বা হবে কেন? রাষ্ট্রপতি তো গালাগালি হতে পারে না। রাষ্ট্রপতি তো শুনেছি বেশ মান্যগণ্য লোক। কিন্তু প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্নটা হল, আমি ওর কাছে কোনোদিন রাষ্ট্রপতি হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না। যে চাকরির জন্যে আমি কোনো দরখাস্তই করলাম না, সে চাকরি থেকে আমাকে খারিজ করার প্রশ্নটা আসছে কোত্থেকে? বন্ধুর চিন্তা-ভাবনার গতি-প্রকৃতি আন্দাজ করতে না পেরে আমি ভোম হয়ে বসে রইলাম। ঠিক করে নিলাম আমি আর কোনো কথা বলব না। ওর নিজের মনোভাবটা নিজেই বিশদ করুক।

আমার দার্শনিক চাপের মুখে বন্ধু নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। বলল, দ্যাখ পেনো, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে তুই নিশ্চয় অনেকবার দেখেছিস।

—একবারও না। ভদ্রলোক কোথায় থাকেন তা-ই জানি না। চিনিও না। এরপর দেখা হলে চিনিয়ে দিবি।

—আঃ! বড্ড বাজে বকিস। সে দেখার কথা হচ্ছে না। আমি টিভিতে দেখার কথা বলছি। টিভিতে রাষ্ট্রপতিকে দেখেছিস তো? রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয় শুনিসনি?

—কস্মিনকালেও না। ঝুটমুট টিভি খুলে রাষ্ট্রপতির ভাষণ শুনতে যাব কেন? আমি তো টিভি খুললে শুধু বিজ্ঞাপনই দেখতে পাই। আমি জানি নানান ধরনের মাল তৈরির বড় বড় কোম্পানিরা টিভি কোম্পানিকে টাকা দেয়। সেই ধার শোধ করার জন্যে টিভি কোম্পানি দিনরাত ওইসব কোম্পানির তৈরি করা মালের বিজ্ঞাপন দেখায়। বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে লোকে যাতে বমি না করে ফেলে সেইজন্যে তার মাঝে মাঝে কিছু নাচগান ঢুকিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে আবার কিছু কিছু খবরও শোনা যায়। ভূমিকম্প, বন্যা, রেল দুর্ঘটনা, নেতাদের হাজত বাস, খবর হিসেবে এগুলো দেখতে নেহৎ মন্দ লাগে না। এর মধ্যে তোমার ওই রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনার সময় হবে না বাপা।

বন্ধুর দেখলাম অসীম ধৈর্য। আমার এ হেন আকাট মূর্খত্ব সত্ত্বেও ও হাল ছাড়ল না। ছিনে জোঁকের মতো লেগে রইল। আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়েই ছাড়বে। ও প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে আর বন্ধুর প্রতি যথাকর্তব্য সাধনের তাগিদে আমিও প্রাণপণে সহযোগিতা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মাথায় যদি না ঢোকে তো কী করতে পারি? ভগবানের মার। মাথাটাকে এত নিরেট করে তৈরি করল কেন?

বন্ধু এবার অন্য পথ ধরল। আমার অস্ত্রেই আমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা।—আচ্ছা, টিভিতে নাচগান দেখিস তো? তাহলে সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে সৈন্য বাহিনীর কুচকাওয়াজও নিশ্চয় দেখেছিস? ওটাও তো একধরনের নাচগান।

—হ্যাঁ, তা দেখেছি। এতক্ষণে বন্ধুর একটা কথায় অন্তত হ্যাঁ বলতে পারায় মনে বেশ আনন্দ হল।

—কুচকাওয়াজে কী দেখেছিস?

—অনেককিছুই দেখেছি। কামান বন্দুক ক্ষেপণাস্ত্র ট্যাবলো ব্যাণ্ডপার্টি হরেক রঙের পোশাক পরা ইস্কুলের ছেলে-মেয়ে, হাতি উটের পিঠে চড়া কিছু রিটায়ার করা বুড়োহাবড়া সৈন্য এই সমস্ত। সবাই বড় রাস্তা ধরে লেফ্‌ট রাইট করতে করতে চলতে থাকে।

—হ্যাঁ চলতে থাকে, তারপর রাষ্ট্রপতির মঞ্চের সামনে এসে রাষ্ট্রপতিকে

অভিবাদন জানায়। রাষ্ট্রপতিও হাত তুলে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। সেখানে রাষ্ট্রপতিকে নিশ্চয় দেখেছিস।

—ওমা ওই লোকটা রাষ্ট্রপতি নাকি? পুরো সময়টা ধরে ক্রমাগত স্যালুট করতে থাকা লোকটা রাষ্ট্রপতি? আমি তো অন্য একটা কিছু ভেবেছিলাম।

—কী ভেবেছিলি?

—না সেটা বলা যাবে না। একটা লোককে ক্রমাগত স্যালুট দিতে দেখলে যা ভাবা উচিত আমি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটা বলা যাবে না। বললে আমার জেল হয়ে যাবে।

—তাহলে তুই রাষ্ট্রপতিকে দেখেছিস।

—হ্যাঁ, মানলাম দেখেছি। আর এটাও বুঝলাম যে রাষ্ট্রপতির কাজ হল স্যালুট করা।

—তোর মতো একটা বেঁড়ে মুখ্যু এর বেশি আর কী ভাববে বল! তা সে কথা থাক। এখন কথা হচ্ছে দেখলেও ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন টিভি ছাড়াও বহু অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে দেখতে পায়। আমি সেই দেখার কথাটাই বলছি।

—তা সেই কথাটুকু বলার জন্যে এত ধানাই পানাই করার কী দরকার ছিল? সোজাসুজি বললেই পারতিস ভারতের রাষ্ট্রপতিকে রোজ অনেক লোক দেখতে পায়। আমি এক কথায় তোর সঙ্গে একমত হয়ে যেতাম। যেটা আমার জ্ঞানের বাইরে সে ব্যাপারে কারো সঙ্গে একমত হতে আমি সবসময় রাজি। তাতে আমার কোনো কষ্ট হয় না, আমাকে কোনো পয়সাও খরচ করতে হয় না। প্রমাণ চাস? তুই একবার বলে দ্যাখ যে কাল শনিগ্রহটা বৃহস্পতি গ্রহের উপর আছড়ে পড়েছিল কিংবা পড়বে। আমি সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে যাব। কেন জানিস? সমস্ত ব্যাপারটাই আমার জ্ঞানের বাইরে। আমি বৃহস্পতিও চিনি না শনিও চিনি না। বারের কল্যাণে ওই নামগুলোই যা একটু আধটু জানি। তার বাইরে আমার জ্ঞানের ভাণ্ডটি ঢুঁ ঢুঁ। শুধু তাই নয়। শনি গ্রহ বৃহস্পতির ওপর আছড়ে পড়লে আমাকে তো কোনো পয়সা খরচ করতে হচ্ছে না।

বন্ধুর মুখে দেখলাম একটা ম্লান হাসি। যাকে বলে হেদিয়ে পড়া হাসি। খুবই স্বাভাবিক। সামান্য একটা কথা বোঝাবার জন্যে পরিশ্রম তো কম করতে হয়নি। বাকিটা বোঝাবার জন্যে আরো কতটা করতে হবে কে জানে।

বন্ধু বলল, হ্যাঁ, 'আমি সেই কথাটাই বলতে চাইছি। এত লোক রোজ রাষ্ট্রপতিকে দেখছে কিন্তু কেউ তাঁকে কোনদিন সিগারেট খেতে দেখেনি।

ব্যাপারটা আমার জ্ঞানের বাইরে। তাই বন্ধুর কথায় আমি সঙ্গে সঙ্গে একমত। কিন্তু একমত হওয়ার কথাটা মুখ ফুটে জানাতে গিয়ে থমকে গেলাম। আমার মাথায় তাল বেতালের মতো দুটো কুযুক্তি গজিয়ে উঠল। এক নম্বরের তালটা হল, এত লোক, যারা রাষ্ট্রপতিকে দেখছে, তারা তাকে সিগারেট খেতে দেখছে কি দেখছে না সেটা বন্ধু জানল কোত্থেকে? তারা সবাই কি রোজ এসে বন্ধুকে কথাটা বলে যাচ্ছে—'ওগো আজ রাষ্ট্রপতিকে সিগারেট খেতে দেখিনি'? আর আমি যদ্দুর জানি বন্ধুর কোনো কম্পুটার নেই যে রাষ্ট্রপতিকে লোকে সিগারেট খেতে দেখেছে কি দেখেনি সেটা ওয়েব সাইটে দেখে নেবে। আর দু'নম্বর কুযুক্তিটা তো একেবারেই বেতাল। কেউ যদি রাষ্ট্রপতিকে সিগারেট খেতে না দেখে তবে তো বুঝতে হবে রাষ্ট্রপতি তাদের সামনে সিগারেট খায় না, লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। সোজা হিসেব।

কুযুক্তি দুটো মুখ ফুটে বন্ধুকে বলেই ফেললাম। বন্ধু আমাকে মারার জন্যে যে থাপ্পড়টা তুলল সেটা যদি সত্যি সত্যি যথাস্থানে নেমে আসত তবে আমি এতক্ষণ তক্তপোশে শুয়ে কাতরাতাম, এই গল্পটা লেখার অবকাশ হত না। ওই যে একটা কথা আছে—মূর্খস্য লাঠৌষধি। বন্ধু এতক্ষণে শেষ কথা হিসেবে সেটাই সার বুঝে নিয়েছে। তবে হাতে লাঠি তো নেই, তাই মূর্খস্য থাপ্পড়ৌষধি।

বন্ধুর থাপ্পড় খাবার ভয়েই আমি স্বীকার করে নিলাম যে রাষ্ট্রপতিরা সিগারেট খায় না। আজ বলে আজ নয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত যত রাষ্ট্রপতি এসেছে গেছে তারা কেউই কোনোদিন সিগারেট খায়নি। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাও কেউ কোনোদিন সিগারেট খাবে না। বন্ধুর কথার সঙ্গে আমি পুরো একমত তো বটেই বরং এক পা আগে। ভবিষ্যতের কথাটাও এখনই বলে নিলাম।

বন্ধু বলল, অ্যাই তো। এই কথাটাই তোকে এতক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করছি।

—হ্যাঁ আমিও খুব ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু তাতে হলটা কী?

—হলটা এই যে তুই যদি সিগারেট খাস তো কোনোদিন রাষ্ট্রপতি হতে পারবি না। রাষ্ট্রপতি হতে চাইলে তোকে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসটা ছাড়তে হবে।

—বাঃ! তার মানে রাষ্ট্রপতি হতে চাইলে শুধু স্যালুট করা শিখলেই হবে না, সিগারেটও ছাড়তে হবে?

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুকে কথা দিলাম—দেখি চেষ্টা করে তোর কথামতো চলা যায় কিনা।

বন্ধুর মুখে একটা বিগলিত হাসি দেখতে পেলাম। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গলে গলে বেরিয়ে আসছে। আমার মতো একটা অকাটকে ও বাগে আনতে পেরেছে সেই আনন্দের ঠেলায় ও ওই একই তক্তপোষে একই রকম ভঙ্গিতে পা মুড়ে বসে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে একবাটি তেল-লঙ্কা মাখানো মুড়ি, একটা ডবল ডিমের ওমলেট আর আগে-পিছে দু'কাপ চা সাঁটিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বন্ধুর ফেলে যাওয়া পাশপাশি দুটো এঁটো কাপ দেখে আবার চিন্তিত হয়ে পড়লাম। লোকে তো এক কাপ চা-ই খায়। দু'কাপ চা তো খায় না। অন্য সবকিছুতেই দুই কিন্তু চায়ের বেলা এক। ভিক্ষে চাইবার বেলা—দুটো পয়সা দিন বাবু। প্যাঁদানি দেবার বেলা উত্তম-মধ্যম দু'ঘা। খাবার বেলা দু'বেলা দু'মুঠো ভাত। পুজোর বেলা দুটো ফুল বেলপাতা। এমনকি একটা ভালো ওমলেট বানাতেও ডবল ডিম। কিন্তু চায়ের বেলা এক কাপ চা। তা সে যতবড় মান্যগন্য ব্যক্তিই হোন না কেন—এক কাপ চা খান স্যার। কিন্তু বন্ধুটি আমার দু'কাপ চা সাঁটিয়ে গেল। তাহলে কি ও এটাকে ভিক্ষে কিংবা প্যাঁদানি হিসেবে নিয়েছে? তোবা তোবা।

সে যাই হোক বন্ধুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমিও ওই বস্তুগুলি গিলেছিলাম। তাই বন্ধু চলে যাবার পর ভরপেট একটু মৌতাত করার দরকার হয়ে পড়ল। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিলাম। দেশলাইটি জ্বালতে যাব কি সেই মুহূর্তেই এইমাত্র বলে যাওয়া বন্ধুর সাবধান-বাণীটা মনে পড়ে গেল।

সিগারেটটা ঠোঁট থেকে খুলে প্যাকেটে ভরে ফেললাম। রাষ্ট্রপতি হবার সম্ভাবনাটা আরো ক'টাদিন জিইয়ে রাখা যাক।

ডায়াবেটিস

মনোজিৎ বিশ্বামিত্র

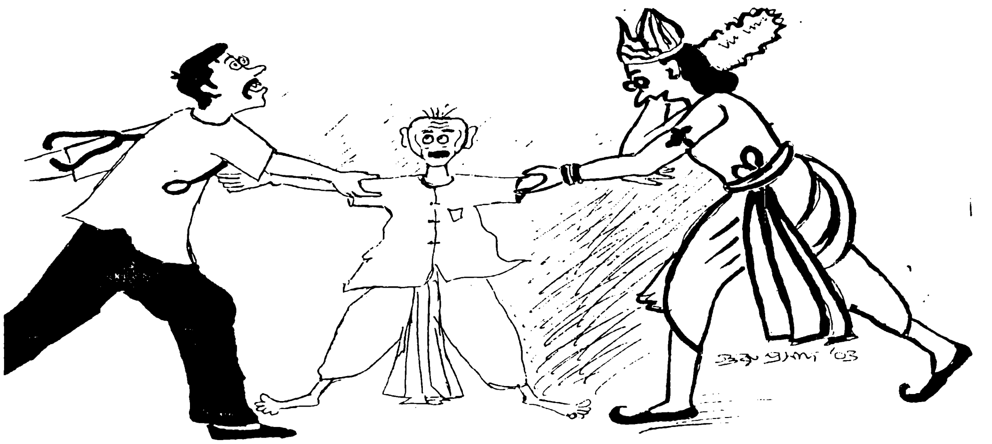

হেলেনকে নিয়ে তখন এথেন্স ও ট্রয়ের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ চলেছে। তখনকার দিনে সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ হত না। যেমন মহাভারত সিরিয়ালেও দেখানো হয়েছে। তা একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জন ট্রোজান সোলজার পায়চারি করতে বেরিয়েছিল। একজন আরেকজনকে বলল, গত ক'দিনে এথেন্সের অনেক বড় বড় বীরকে মারলাম। ম্যাকসিমাস, জেনোক্রেটিস, এপিগোনাস, মেলিয়াটিস—সব ক'টাকে খতম করেছি। কিন্তু এই ডায়াবেটিস আমাকে কাবু করে ফেলল।

তার সঙ্গী গর্জে উঠল—কাল দেখিয়ে দিস তো। বেটাকে যদি না মারি তো....

আপনাদের মধ্যে যাদের ডায়াবেটিস আছে, তাঁরা জানেন ডায়াবেটিসকে মারা যায় না। ডায়াবেটিসই মারে। তবে রাতারাতি নয়, আস্তে আস্তে। এই ব্যাপারটা উপভোগ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমার ডায়াবেটিস হওয়ার পর আমি খুবই আনন্দে আছি। গোটা জীবনের ছক বদলে গেছে। মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান বেড়েছে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-অনাত্মীয় পরিচিত-অপরিচিত সকলের কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ পাচ্ছি। আবিষ্কার করছি যে এ বন্ধুর পথে আমি একা নই। আমার জানাশোনা অধিকাংশ লোকেরই ডায়াবেটিস আছে। তাঁরা ওষুধ খান। হন হন করে হাঁটেন। লুকিয়ে দোকানে গিয়ে সন্দেশ খান। ডায়াবেটিস সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেন।

আমি হোমিওপ্যাথি চেষ্টা করেছিলাম। আগামী দশ বছর ওষুধ খেলেই সেরে যাবে, বললেন হোমিওপ্যাথ। ডানদিক ফিরে শোওয়া বারণ, জীবনমুখী গান শোনা বারণ, দেশ পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাস পড়া বারণ। উচ্ছে খাওয়া আবশ্যিক। মদ সিগারেট চলবে না। আমি ভেবে দেখলাম, দশ বছর বাঁচা কোনোমতেই সম্ভব নয়। সুতরাং ওষুধ খাওয়া কেন? খাইনি।

অ্যালোপ্যাথের কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি সাতাশটা টেস্ট করাতে দিলেন। মোট খরচ ৩২,৫০০ টাকা। এক একটা টেস্ট এক এক জায়গায়, তার সবগুলিতেই তিনি জড়িত আছেন। অর্থাৎ সর্বত্রই কমিশন বাঁধা আছে। তা থাক। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কে ৩২,৫০০ টাকা নেই। সুতরাং অ্যালোপ্যাথি হল না।

কবিরাজি চেষ্টা করেছিলাম। তিনি প্রথমে নাড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, হবে না। কী হবে না? চিকিৎসা। কেন? নাড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে আর বিশেষ সময় নেই। নাড়ি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে পাবে। বলে জপ করতে লাগলেন।

বন্ধু-বান্ধবরা এক তান্ত্রিকের কাছে পাঠালেন। তিনি এক শিশি তরল পদার্থ দিলেন। ঐটি নিয়ে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে গঙ্গার পাড়ে যেতে হবে। কোন এক আশশ্যাওড়া গাছের নিচে শিশিটি মাটিতে রেখে শীর্ষাসন করতে হবে দশ মিনিট। তারপর ঐ তরল পদার্থটি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে ১০৮ বার বলতে হবে কষটকার কষটকার কষটকার। তারপর বাড়ি ফিরে আসতে হবে। শিশির বস্তুটি খেলে কিন্তু নির্ঘাৎ মৃত্যু। ফি ২৫০ টাকা। ওতে আমার সাতদিনের বাজার হয়ে যায়। তাই চেষ্টা করিনি।

জ্যোতিষীর কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি বললেন আগামী বুধবার মঙ্গল, শনি আর রাহু একসঙ্গে একই ঘরে ঢুকেছে। তার একমাসের মধ্যে হয় আমার ডায়াবেটিস সেরে যাবে, অথবা আমার রিষ্ট হবে। রিষ্ট মানে মৃত্যু। তারপরে অনেক বুধবার কেটে গেছে। সারেওনি, রিষ্টও হয়নি।

স্থানীয় এক পার্টির দাদার কাছে গেলাম। তাঁর মত—বর্তমান আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ডায়াবেটিস জাতীয় ব্যাপার এড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষত বিশ্বায়নের পর ওগুলো বেড়ে উঠছে। লড়তে হবে। বর্তমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে খুবই মুশকিল, তবে পার্টির আগামী জোনাল কনফারেন্সে তোলা যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা জোগালো এক পুরনো বন্ধু। তার সাহিত্যিক হবার বাসনা ছিল। সুবিধে করতে পারেনি। মাঝে মাঝে ছড়া লেখে। পাঁচটি লাইন আমার জন্যে লিখে দিল :

রক্তে যদি একটু বাড়ে শর্করা,
ডাক দিয়েছে জেনো কালের হরকরা,
চিনি খেয়ো না চায়ে
রোজ হেঁটো জোর পায়ে,
যমের সাথে যায় না জেনো দর করা।

অকপটে

কি ব্যাপার? ইঁদুরগুলো কি এদের দেখতে পায়নি? হতেই পারে না। যারা কাঠ ফুটো করে বই ধ্বংস করে তারা চোখের সামনে পড়ে থাকা খাবার খাবে না?

পারভার্টেড উইপোকারা

সমরেশ মজুমদার

গতবছরের বইমেলায় কানুবাবু কিছু বই কিনেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের যত নামি-দামি বই তা এর আগেই তাঁর আলমারিতে জায়গা পেয়েছে। গত চল্লিশ বছরের সেইসব সংগ্রহ তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়েছেন। পথের পাঁচালীর প্রথম সংস্করণ, হাঁসুলিবাঁকের প্রথম সংস্করণ অতি যত্নে রেখেছেন তিনি। গতবার বইমেলায় গিয়ে মনে হল আজকের ছেলেদের লেখা তাঁর পড়া উচিত। হালফিল সাহিত্যের কথা না জানাটা অন্যায়। তরুণ লেখকদের কয়েকটি গল্প এবং কবিতার বই-এর সঙ্গে একটি মোটা উপন্যাসও কিনেছিলেন যার রচয়িতার কোনো লেখা এর আগে তিনি পড়েননি। কিন্তু অজানা লেখকের এত মোটা উপন্যাস যখন প্রকাশক সাহস করে ছাপছেন তখন নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

বাড়িতে ফিরে কানুবাবু বিপাকে পড়লেন। তাঁর বই-এর দুটো আলমারিতে এক ফোঁটা জায়গা নেই। নতুন আলমারি কেনার কথা ভেবেছিলেন, কেনা হয়নি। নতুন কেনা বইগুলো একটা টেবিলে রেখে দিয়েছিলেন তখনকার জন্যে। একেবারে নিচে মোটা বইটি, তার ওপরে পাতলাগুলো।

কানুবাবু বিপত্নীক। একমাত্র কন্যা থাকে আমেরিকার নিউজার্সিতে। সেখান থেকে ফোন এল মেয়ে খুব অসুস্থ। জামাই বলল, 'বাবা, তাড়াতাড়ি চলে আসুন।'

দশবছরের ভিসা আগে থেকেই নেওয়া ছিল, ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে কানুবাবু মেয়ের কাছে উড়ে গেলেন। মেয়ের বুকে ক্যানসার ধরা পড়েছে। তার চিকিৎসার সময় পাশে থাকলেন, অপারেশন হল, ডাক্তার বললেন, 'আপাতত বিপদ নেই।' এই করতে এগারো মাস চলে গেলে মেয়েকে কিছুটা সুস্থ দেখে কানুবাবু ফিরে এলেন।

এবারের বইমেলার বিজ্ঞাপন দেখে কানুবাবুর মনে পড়ল গতবারে কেনা বইগুলোর কথা। দেশে না থাকায় পড়া হয়নি অথচ আর একটা বইমেলা এসে যাচ্ছে। কানুবাবু লজ্জিত হলেন। সেইদিন হঠাৎ তাঁর কানে খচর খচর শব্দ বাজল। কি ব্যাপার? শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে বই-এর আলমারির কাছে পৌঁছতেই দেখলেন দু'টো ইঁদুর পেছন দিক থেকে পালিয়ে গেল। সর্বনাশ।

তাদের গর্তের সামনে বইগুলো রেখে গবেষকের চোখে তাকালেন। তখনই কাণ্ডটা ঘটল। হাজার খানেক যেন প্রাণের দায়ে কার্জন পার্ক ছেড়ে পালাতে চাইল রাজভবনের দিকে।

তাড়াতাড়ি আলমারি খুলেই তিনি মাথায় হাত দিলেন। তাঁর এগারো মাসের অনুপস্থিতিতে দু'টো আলমারির পেছনের নরম কাঠ ফুটো করে ইঁদুরেরা ঢুকে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতাকে খেয়েছে। একে একে দেখতে পেলেন—শরৎচন্দ্র, বিভুতিভূষণ, তারাশঙ্কর, এমনকি সমরেশ বসুকেও বাদ দেয়নি রাক্ষসগুলো। কোনোটার খানিকটা কাটা, কোনোটার অর্ধেকটাই। ঝুরুঝুরু পড়তে লাগল কাগজের টুকরোগুলো। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন কানুবাবু। প্রতিজ্ঞা করলেন, ইঁদুরগুলোকে পরলোকে না পাঠিয়ে জলস্পর্শ করবেন না। সেদিনই ইঁদুর মারার বিষ প্রয়োগ করতে গোটা দশেক লেংটি এবং চারটে মজবুত ইঁদুরের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তিনদিন পরে ওদের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছলে দেখা গেল আর কোনো ইঁদুর এদিকে পা বাড়াচ্ছে না।

ইঁদুরেরা ঢুকে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতাকে খেয়েছে। একে একে দেখতে পেলেন— শরৎচন্দ্র, বিভুতিভূষণ, তারাশঙ্কর, এমনকি সমরেশ বসুকেও বাদ দেয়নি

ইঁদুরকুল ধ্বংস করে ছিন্নভিন্ন বইগুলোর কথা ভাবতে বসে কানুবাবুর নজর পড়ল টেবিলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফাঁপরে পড়লেন। গত বইমেলায় কেনা বইগুলো টেবিলের ওপর খোলা পড়ে আছে এগারো মাস। ওগুলো নিশ্চয়ই আস্ত নেই। হাত বাড়িয়ে প্রথম কবিতার বইটা তুলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন কানুবাবু। একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই। প্রতিটি পাতা আস্ত, এখনো নতুন-নতুন গন্ধ বের হচ্ছে। দ্বিতীয় বইটি তুললেন, ছোটগল্পের।

সেটাও নতুন হয়ে আছে। কি ব্যাপার? ইঁদুরগুলো কি এদের দেখতে পায়নি? হতেই পারে না। যারা কাঠ ফুটো করে বই ধ্বংস করে তারা চোখের সামনে পড়ে থাকা খাবার খাবে না? কিন্তু খায়নি তো!

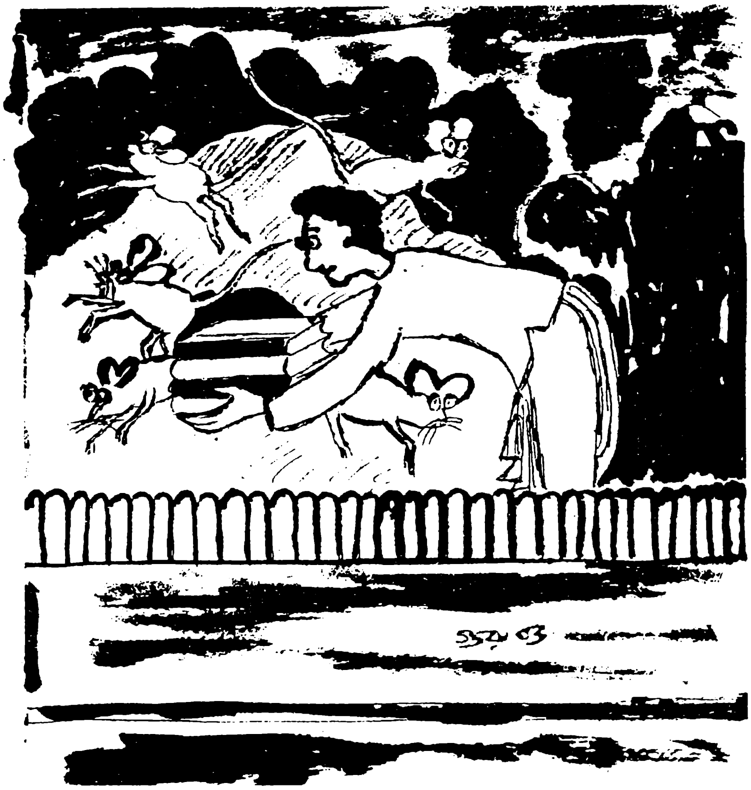

কানুবাবু ভাবতে বসলেন। অনেক ভেবে মনে হল, এটা আধুনিক প্রকাশনার অবদান। এখন নিশ্চয়ই বই-এর মলাট ছাপার সময় এমন কেমিক্যাল মিশিয়ে দেওয়া হয় যা ইঁদুরদের সহ্য হয় না। দূর থেকে তার ঘ্রাণ পেয়ে ওরা এদিকে এগোয়নি। তাড়াতাড়ি এক পরিচিত প্রকাশককে ফোন করে প্রশ্নটা করলেন কানুবাবু। প্রকাশক আকাশ থেকে পড়লেন। কই, এমন কথা তো তাঁর জানা নেই। উল্টে তিনি কানুবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এই আবিষ্কারের জন্যে। এখন যেসব বই তাঁর প্রকাশনা থেকে বের হবে তাতে তিনি এই এক্সপেরিমেন্ট করবেন। অবশ্য তাতে অসুবিধে আছে। অনেক পাঠক পাতা ওল্টান জিভে আঙুল স্পর্শ করে। যে বিষে ইঁদুর মরে সেই বিষ পাঠকের শরীরে যাওয়া ঠিক নয়। অবশ্য একটা ওয়ার্নিং ছেপে দেওয়া যেতে পারে মলাটের এককোণায়।

নিজের ভাবনা সঠিক নয় জানার পর কানুবাবু মুষড়ে পড়লেন। দু-একটা ইঁদুর ধরে এনে তাদের বইগুলোর ওপর বসিয়ে দিয়ে দেখলে হত! কিন্তু এখন এখানে ইঁদুর পাবেন কোথায়। তখনই মনে পড়ল। পাতলা বইগুলো তুলে ছুটলেন কার্জন পার্কে। সেখানে গর্ত থেকে বেরিয়ে লুটোপুটি করছে হাজার খানেক ইঁদুর। তাদের গর্তের সামনে বইগুলো রেখে গবেষকের চোখে তাকালেন। তখনই কাণ্ডটা ঘটল। হাজার খানেক যেন প্রাণের দায়ে কার্জন পার্ক ছেড়ে পালাতে চাইল রাজভবনের দিকে। পটাপট্ ছুটন্ত বাস-গাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তারা, তবু কার্জন পার্কে থাকতে চাইছিল না।

বইগুলো নিয়ে ফিরে এসে কানুবাবুর নজর পড়ল মোটা বইটির দিকে। দু'হাতে তুলতে গিয়ে বেশ হালকা লাগল। পাতা ওল্টাতেই আর এক চমক। পুরো বইটির তিনভাগের দু'ভাগ সুন্দরভাবে খেয়ে ফেলেছে উইপোকারা। খেয়েদেয়ে চলে গেছে। আশ্চর্য! শুধু এই বইটা, তাও পুরোটা নয়, উই খেয়ে গেল? কানুবাবু প্রথম থেকে পড়তে আরম্ভ করলেন। বেশ ভালো লাগছিল পড়তে। উইপোকা যে সব জায়গা সুনিপুণভাবে খেয়ে গেছে সেগুলো ছাড়াই পুরো উপন্যাস পড়ে ফেলে মনে হল খুব শক্তিশালী কলম। বেশ ভালো লেখা। কিন্তু বাকি দুই তৃতীয়াংশের লেখা পড়া হল না, এ হতে পারে না। তিনি বাজার থেকে আর একটা বই কিনে এনে উইকাটা অংশগুলো পড়তে গিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। পরে চোখ খুলে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলেন, উইগুলো সেইসব অংশ খেয়ে গেছে, যেখানে চিৎপুরের মলাটহীন চটি বই থেকে টোকা হয়েছিল।

কানুবাবু সিদ্ধান্তে এলেন, উইগুলোতে কোনো স্ত্রী-উই ছিল না, সব পারভার্টেড পুরুষ উই।

জবর খবর

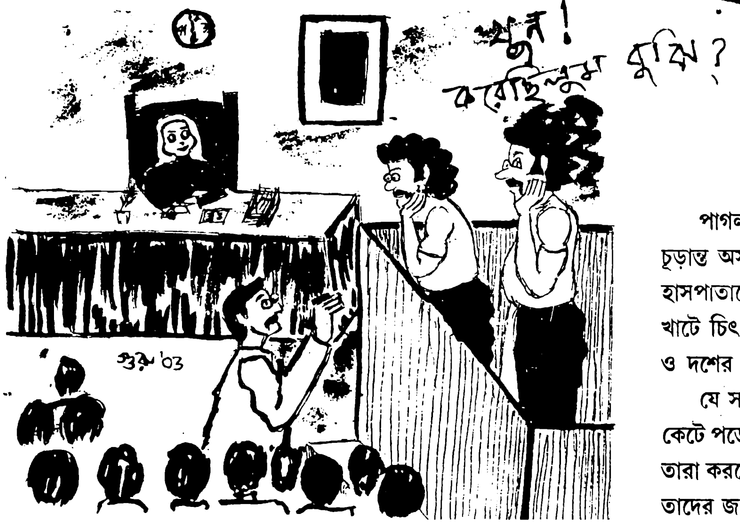

পাগল নয়, মনোরাগী

পাগল তো নয়, মনোরোগী ওনারা। পাগলা গারদে দেওয়া মানেই মনের চূড়ান্ত অসম্মান। তাই সূর্যকান্ত মিশ্র উঠেপড়ে লেগেছেন। পাতালে, না না, হাসপাতালে মনের রুগিদের জন্যে এবার আলাদা ব্যবস্থা। আলাদা জায়গায় খাটে চিৎ হয়ে তাঁরা মনের চর্চা করবেন। বহুৎ চিন্তা খরচা করবেন। দেশ ও দশের কথা ভেবে ভেবে মাথায় টাক গজাবেন।

যে সব কুকুররা হাসপাতালে ঢুকে সদ্যোজাতকে মুখে নিয়ে সুড়ুৎ করে কেটে পড়ে তারাও অবশ্যই মানসিকভাবে সুস্থ নয়। নইলে এমন দুষ্কর্ম কখনোই তারা করতে পারত না। কিন্তু সর্বস্বান্ত সরকারের কথা ভেবেই সম্ভবত সূর্যকান্ত তাদের জন্যে আলাদা ওয়ার্ড তৈরির উদ্যোগ নেননি। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ— বিষয়টি নিয়ে মানেকা মনে মনে খুবই গবেষণা করছেন।

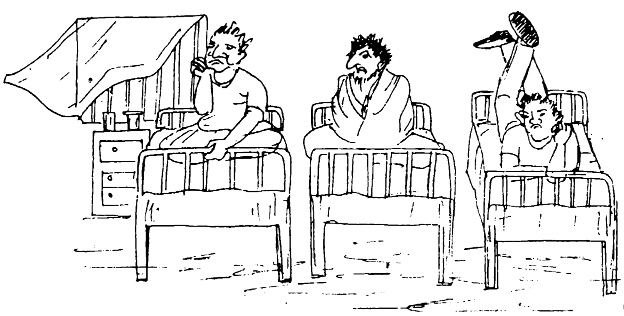

খুন! করেছিলাম নাকি?

ন'বছর কেটে গেছে। ভুলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কুরদুস আলম আর মহম্মদ একলাখ-এর স্মৃতিশক্তিও তেমনি ঝাপ্‌সা হয়ে আসছিল। ন'বছর আগে একটি বালককে খুন করেছিল তারা। জবরদস্ত প্রশাসন এবং মহামান্য আদালত মাত্র ন'টি বছর নিয়েছে তাদের সাজা দিতে। ঘটনা মনে করতে গিয়ে কুরদুস আর একলাখ এক লাখ বার মাথা চুলকোচ্ছে। আর কটা বছর সময় নিলে তারা বেহেস্ত্‌-এ বসে দুনিয়ার বিচারটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারত। বড়ই মনে কষ্ট পেয়েছে দুই স্যাঙাৎ।

হায় রোমিও!

পাড়ার রোমিও মরলে তার বাপ-মা ছাড়া আর কেউই কাঁদে না। কিন্তু এ রোমিও সে রোমিও নয়। প্রেমিক রোমিও। প্রাণেশ্বর রোমিও। না না, শুনলে ঘোড়ায় হাসব না, বরং কাঁদব। কারণ রোমিও নিজেই যে ঘোড়া। ঘোড়াটি কর্মরত অবস্থায় সেই যে পড়িল, আর উঠিল না। আর তাই দেখে মনোবৈকল্য ঘটেছে তার প্রেমিকা পিঙ্কির। আর তাজ্জব কি বাত্‌, এই রোমিওগিরি তথা অবৈধ প্রণয় দিনের পর দিন পুলিশের নাকের ডগায় নয়, একেবারে ঘরের মধ্যে যাকে বলে আস্তাবলে—পুলিশ কিচ্ছুটি জানতে পারেনি! অবশ্য রোমিও মৃত্যুতে পিঙ্কির তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে পুলিশের টনক নড়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে—এত বড় দুষ্কর্মটি কী করে চুপিসাড়ে সম্পন্ন হচ্ছিল। পুলিশ কোডে ঘোড়াদের প্রণয়ের অধিকার নিয়ে কিছু বলা আছে কি না, দেখা হচ্ছে তাও।

বুড়ো বয়েসে ধেড়ে নেত্য

পণ্ডিত রবিশঙ্কর বুড়ো বয়েসে সুকন্যাকে নাচাতে নাচাতে নিজের ঘরে টেনে এনেছিলেন। থুখুরে হওয়ার পর বোধহয় এবার তাঁর নিজেরই সাধ হয়েছে নাচবার। প্রথম পরিবার অন্নপূর্ণার সূত্রে নাতনি কাবেরী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কলকাতায় এসেছেন নাচতে এবং শহরকে নাচাতে। সবার আগে তিনি বুঝি বা দাদুকেই নাচিয়ে নিয়েছেন একপাক। পণ্ডিতজি মনে মনে বোধহয় গাইছিলেন—নেচে নেচে আয় মা শ্যামা। তবে সুকন্যার মতো আর কেউ শাঁখা-সিঁদুর পরে নাচতে নাচতে পণ্ডিতবাজির ঘরে ঢুকে পড়বে—এ সম্ভাবনা এখনো দেখা যাচ্ছে না। একটি সংবাদপত্র তার চমৎকারিত্বে এইভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছেন—"রবিশঙ্কর ও অন্নপূর্ণার নাতনির নাচ দিল্লিতে"। এটি হল শিরোনাম। যদিচ সংবাদ অংশে পণ্ডিতজির নাচার কোনো খবরই নেই। সম্ভবত নিভৃতে তাঁরাই একমাত্র এই নেত্যটি দেখেছেন। দিল্লিকা লাড্ডু, থুড়ি নেত্য।

গরুক্ষেত্তর

যাকে বলে কুরুক্ষেত্তর, তাই ঘটে গেল শক্তিগড়ে। একটা বাইপাস তৈরি করতে গিয়ে ল্যাংচা শিল্পকে প্রায় টা টা বাই বাই করে ফেলছেন সরকার। ল্যাংচার ওপরে এমন ল্যাং মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছে না শক্তিগড়ের লোকেরা। তারা গরুর রথে চড়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শ-খানেক গরুর গাড়ি চড়ে হাতে ঝাণ্ডাটাণ্ডা নিয়ে তারা একেবারে গরুক্ষেত্তর করে ফেলেছে। তিনজন পুলিশ গরুর গুঁতোয় কাৎ হয়েছেন। অক্ষৌহিনীকে অতএব পুলিশ বেধড়ক রুলপেটা করেছে। আঠারোজন, গুনে গুনে আঠারোজন চিৎপাত। কথায় বলে না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! গরুর পালে বাঘ পড়লে সে ছাড়া আর কীই বা হবে?

পছন্দমতো

যে কোনো দুটো শারদীয় সংখ্যা এবং ইচ্ছেমতো পনেরোটা সাধারণ সংখ্যা পত্রপাঠ নিয়ে যান মাত্র ১০০ টাকায়।

এই সুযোগ শুধুমাত্র বইমেলার কটাদিন। মনে রাখবেন, পত্রপাঠ-এর অনেক সংখ্যাই শেষ হয়ে গেছে। অন্য সংখ্যাগুলোও আপনার জন্যে বিশেষ অপেক্ষা করবে না। পত্রপাঠ পুনর্মুদ্রণ হয় না। অতএব......বইমেলা ২০০৩, স্টল নং : এস-২৯৪

ছবি আঁকা

যে কোনো রকমের ছবি আঁকতে (কার্টুন, স্টিল লাইফ, পোর্ট্রেট, লাইফ ড্রয়িং) অথবা— বাচ্চাদের ছবি আঁকানো শেখানোর জন্য (বাড়ি গিয়ে শেখানোর সুবিধাও পাবেন) এবং কাপড়ে নতুন ডিজাইন করাতে ইচ্ছুক থাকলে দয়া করে নিম্নলিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

(শোভিক বসু রায়) যাদবপুর

ফোন : ২৪৮৩-৩১৪০

(সকাল ৮-১২ টা রাত্রি ৯টার পর)

সং-এর যোগ্যতা

শরদিন্দু কর

সনাতনদাদু পাড়ার পাকামাথা মানুষ। পাড়া-পড়শিদের সুপরামর্শ দেন। মাঝে মাঝে একটি গল্প শোনান সকলকে।

তখন ফজলুল হক সাহেব ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)। একদিন হক সাহেবের গ্রামের একজন বয়স্ক মানুষ তাঁর ছেলের জন্যে কিছু করে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কাছে এসে খুব ধরাধরি করেছিল।

হক সাহেব জানতে চাইলেন ছেলে পড়াশুনা কত দূর কি করেছে।

লোকটি উত্তর দেয়, ম্যাট্রিক পাশ করেছে তবে কলেজে গিয়ে পড়াশুনায় তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

তিনি জানতে চাইলেন, চাষবাস বা অন্য কাজকর্ম কিছু শিখেছে?

তার উত্তর এল, না হুজুর সে সব কিছু শেখেনি। কাজকর্ম কিছু করতে চায় না।

তখন হকসাহেব শুধালেন, তাহলে কী করে?

ছেলের বাবা মাথা নিচু করে অপরাধী ভঙ্গিতে বলল, কি বলব দুঃখের কথা, সারাদিন চায়ের দোকানে বসে শুধু চা-সিগারেট ওড়ায় আর গুলতানি করে রাজা-উজির মারে। তবু হুজুর আপনি ওর জন্যে একটা কিছু করে দেন। ছেলের বাবা হাত জোড় করে। হক সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন, তাই তো হে, ওকে মন্ত্রী করে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু যে ভাবতেই পারছি না আমি।

সনাতনদাদুর কাছে সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন।

তিনি ছেলের ব্যাপারে খুব চিন্তিত। তাই জানতে চাইলেন ছেলের কোন লাইনে যাওয়া ঠিক হবে। সনাতনদাদু প্রশ্ন করেন—পড়াশুনায় কেমন, জয়েন্ট বা ওই ধরনের কোনো পরীক্ষায় বসেছিল?

ভদ্রলোক জানালেন, বসেছিল তবে কিছু করতে পারেনি।

—কী নিয়ে পড়েছে?

—আজ্ঞে, সায়েন্স বা আর্টসে অনার্স পায়নি। পাশ কোর্সে বি এ পাশ।

—সাহিত্য, গান বা অভিনয় কিছু জানে?

—কবিতা লেখে। তবে ওর কবিতা নাকি তেমন কেউ বুঝতে পারে না। তাই ছাপা হয় না। গান জানে না, তবে ক্যাসেটে রিমেক গান মাঝে মাঝে শোনে। অভিনয়টাও করতে পারে না তবে দলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। চেয়ার সাজায়, মাইক ফিট করে, রিহার্সলে চা এনে দেয়, পর্দা টানে।

—জেনারেল নলেজ কেমন?

—ছেলে বলে, আজকাল জেনারেল নলেজের কোনো দাম নেই। ও সব শুধু কোটিপতি সিরিয়াল দেখতে লাগে।

—আন্তর্জাতিক খবরাখবর রাখে?

—না, বলে—ওয়াশিংটন। চীনে কিংবা লেবাননে কোথায় কি হল খোঁজ রেখে লাভ কি?

—দেশের খবর রাখে? খেলাধূলো করে?

গুলতানি করে রাজা-উজির মারে। তবু হুজুর আপনি ওর জন্যে একটা কিছু করে দেন। ছেলের বাবা হাত জোড় করে। হক সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন, তাই তো হে, ওকে মন্ত্রী করে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু যে ভাবতেই পারছি না আমি।

—দেশের খবর মানে পশ্চিমবঙ্গ আর সেটা ও চায়ের দোকানে বসে জেনে নেয়। খেলাধূলা করে সময় নষ্ট করতে চায় না বরং সেই সময়টা টিভির পর্দায় মারদাঙ্গার সিরিয়ালগুলো দেখে। তবে মাঝে মাঝে তিন পাত্তির তাস খেলে বন্ধুবান্ধবদের সাথে ফূর্তি করে।

—কী ভালোবাসে?

—খুন ডাকাতি ধর্ষণ আর অ্যাকসিডেন্টের খবরে খুব ইন্টারেস্ট। তার সাথে আত্মহত্যা, রাজনীতি, হাওয়া বুঝে করে। যত বড় মানুষই হোক তার মুখে চুনকালি মাখাতে ওস্তাদ, চুনোপুঁটিদের কথার জোরে রাঘব বোয়াল বানাতে পারে—তিলকে তাল তালকে তিল....।

সনাতনদাদু ওর নিজের গল্পের হক সাহেবের মতো হাত দিয়ে থামিয়ে দেন। বলেন, থাক থাক আর বলতে হবে না, বুঝে গেছি। তিল থেকে তালেবর হয়ে যাবে আপনার ছেলে। যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনো খবরই রাখে না, খুন জখম, ধর্ষণ, পথ দুর্ঘটনা ডাকাতি আর আত্মহত্যাতেই ওর এত ইন্টাররেস্ট তখন সেরকম বাংলা কাগজের দপ্তরে ওকে ঢুকিয়ে দিতে পারলে বিখ্যাত হয়ে যেতে পারবে দু'দিনেই।

আপনার ছেলের ওই ভয়ঙ্কর জ্ঞান নিয়ে সেই সব বাংলা কাগজের সং, থুড়ি সাংবাদিক হওয়া ছাড়া অন্য লাইনে যাওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না।

দিস মা গরু করে! চামড়ার ভয় নেই গরুদের। চামড়ার কারবার তো মেনকা রম্ভারা কবে থেকে করছে। এখন তো লাইসেন্সধারী কারবারী আছে শ'য়ে শ'য়ে। ইউনিয়ন করছে। একাডেমিতে আদিকলার প্রদর্শনী দিচ্ছে। বুকফেয়ারে বুক-খোলা স্টল দিচ্ছে।

আবার বাঁচি

দিব্যেন্দু দাস

মাগো, পরের জম্মে যেন পুরো গরু হয়ে জন্মাতে পারি। অনেকটা হয়ে এসেছি। আর একটুখানি। হাতদুটোকে নামিয়ে পা বসিয়ে দিস মা। লেজ দিলে দিস। না দিলেও চলবে। সিং তো আর কাজেই লাগে না। হসপিটালের ই. সি. জি। শেষবারের মতো বিবর্তন দে মা। আর চাইব না, গরুরা যে কী চায় তা আজ পর্যন্ত সাতপুরুষের গোয়ালারাও জানতে পারল না। আর কেনই বা চাইবে? পিচের রাস্তার ধারেও ঘাস গজায়। দশফুট রাস্তার ছ'ফুট পিচ। দু'পাশে দু'ফুট করে মাটি। পরীক্ষার খাতার মার্জিন। বরাত পাইয়ে দিয়ে অফিসারের মার্জিন। ক'দিনেই সেই মাটিতে মায়ের ম্যাক্‌ডোয়েল, আমিনিয়া, অম্বর, পিয়ারলেস-ইন্, বসন্ত কেবিন! গোয়াল থেকে বেরিয়ে নাদাখানেক গোবর ছড়িয়ে লেজ দুলিয়ে মায়ের ভোগ! গোয়ালে থাকলেও পাচ্ছে। গোয়ালার মাতৃভোগ। এমনকি গোয়াল থেকে ফুসলে বেরিয়ে জি. টি. রোড ধরলেও পাচ্ছে। দিস মা গরু করে! চামড়ার ভয় নেই গরুদের। চামড়ার কারবার তো মেনকা রম্ভারা কবে থেকে করছে। এখন তো লাইসেন্সধারী কারবারী আছে শ'য়ে শ'য়ে। ইউনিয়ন করছে। একাডেমিতে আদিকলার প্রদর্শনী দিচ্ছে। বুকফেয়ারে বুক-খোলা স্টল দিচ্ছে।

দক্ষিণেশ্বরে থাকতে ঠাকুর একবার রানীকে চড় কষিয়ে বলেছিল, তোর অমন কথাকলি-রাবণের মতো চোখ ঘোরে কেন? গরুর মতো চোখ চাই। তবে মাকে পাবি।

ঠাকুর ঠিক বলেছিলেন। গরু চোখ মারে না। গরুর চোখে সন্দেহ নেই। স্বপ্ন নেই। ঘেন্না নেই। বাস্তুঘুঘুদের চাহনি নেই। স্কুলের মাঠ প্রমোটারের হাতে তুলে দেবার বাসনা নেই। নির্জন পথে যুবতী দেখে চক্‌চক্ করে না। সাপখেলা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে না। লেডিস সিটের সামনে দাঁড়ালে মণিদুটো খুলে মামনির জামার ভেতর চলে যায় না। গরুর চোখ কত উদাসীন! মন্ত্রীদের মতো। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সে রাতে সবকটা মারা গেল। ওষুধের অভাবে। নার্স ইউনিয়ন সারাদিন ঘেরাও করে রেখেছিল 'উদাসীন' মন্ত্রীকে!

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে দুশ্চিন্তাই দুশো রোগের কারণ। উদাসীনতাই স্বাস্থ্যের সিক্রেট। গরুদের চশমা লাগে না! চারেও যা চল্লিশেও তা। স্ক্যাম্‌-ফ্রি ডাবা ডাবা! মাহাপুরুষদের যেমন। রবিঠাকুর থেকে রামঠাকুর—সব তাকিয়ে আছে অপলক চোখে। ফ্রেম-বন্দী হাবা হাবা! দেবতারাও গরুবৎ তুষ্ট, ভক্ত প্রেমে! এই ক'দিন আগে নরেন্দ্র মোদী বড় করে হোম করেছে গোধরায়। তার আগে হাজারখানেক নরবলি হয়েছে। কাশ্মীরে তো কুরবানির মেলা লেগেছে। হিউম্যান লেক্সপো। বুকফাটা ফেয়ার। প্রশাসনে গরু। চেয়ারের নিচে জাব। খুলি ভর্তি গোবর। চোখে সেই 'চলো যাই চলে যাই' দৃষ্টি। দিস মা, দিস মা গরু করে।

সৌরশক্তি জিনবিদ্যা, পরমানু, জীবানু—সব তুই রাখ মা। শুধু দুটো বাঁট দিয়ে পাঠিয়ে দে। চরে খাই। পারলে দু'টোর পাশে আর চাট্টি ঝুলিয়ে দিস মা। গরিব গোয়ালার ইন্‌জেক্‌শানটা বেঁচে যায়। আমার পাছাটাও বাঁচে। তবে জলে ডোবা থেকে দুধ হয়ত বাঁচবে না মা! গোবর একটু কেজিতে বাড়িয়ে দিস মা। গ্যাসের দামে আগুন লেগে গেছে। আবার দেওয়াল ভরে উঠুক ঘুঁটেতে। ক্ষেত ভরে উঠুক সারেতে।

মাগো, আবার বাঁচি খুঁটের দড়ির ওপর গা এলিয়ে ভেজিটেবিল চাউমিন চিবিয়ে। আবার বাঁচি তুলসিগাছে মুখ বাড়িয়ে চাষীবউয়ের খিস্তি শুনে শুনে। আবার বাঁচি বটের গোড়ায় রাম-রহিমের এঁটো তাড়ির হাঁড়ি চেটে চেটে। আবার বাঁচি নীল আকাশের নিচে। কারখানার ভোঁ শুনে শুনে।

মারায়ণ

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

মর্ত্যলোক— ৩

চব্যন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর।।
—কৃত্তিবাস।

বাপ-মায়ের দেওয়া নাম রত্নাকর। ভালো বাড়ির ছেলে। বাবা কলেজের অধ্যাপক। অতি সজ্জন ব্যক্তি। ক্লাশে পড়াতেন ভালোই। ছাত্ররাও মন দিয়ে লেকচার শুনত। লেকচারের মধ্যিখানে মুখে বই চাপা দিয়ে খুব একটা কুকুর-বেড়াল ডাকত না। এমনকি কেউ কেউ ক্লাশের খাতার নোটও নিত। ভদ্রলোকের আর সবই ভালো। শুধু দোষের মধ্যে পান খাওয়া। পান খাওয়াটা অবশ্য কিছু দোষের নয়। পান করাটা দোষের তালিকায় পড়ে। আজ্ঞে না, দোষাবহ পান বলতে আবার জল পানের কথাও হচ্ছে না। সে পান এমন এক পান যেটা করলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কিক মেরে দেয়। আর ধরণীতলের আকর্ষণ এড়িয়ে শুধু উড়তে ইচ্ছে করে। ইংরাজিতে বলে ড্রিঙ্ক। রত্নাকরের পিতাঠাকুর সেরকম পান করতেন না। উনি পান খেতেন। এ পানে দোষ নেই।

মুখ ভর্তি পান। সারাদিন শুধু চ্যাবোর চ্যাবোর করে চিবিয়েই চলেছেন। ছাত্ররা আড়ালে ডাকত 'পান চিবানো স্যার।' ছাত্রদের বয়স কম। মাথার মধ্যে রাখা গোবর যথেষ্ট কাঁচা। তাই মগজগুলি যথেষ্ট উর্বর। উর্বর মগজ থেকে আগাছার মতো গজ গজ করে গজাতে থাকে শিক্ষক অধ্যাপকদের জন্যে সুন্দর সুন্দর খাপ খাওয়ানো নাম। যেমন হরগোবিন্দ ঘোষ, এইচ জি জি হয়ে যান হাগুবাবু, প্রতুলচন্দ্র মুখার্জী, পি সি এম হয়ে যান পিসিমা আর রঘুনাথ দত্ত, আর এন ডি তো এক ঝটকায় রেণ্ডি। 'পান চিবানো সার' ছাত্রদের মুখে প্রমোশন পেতে পেতে হয়ে গেল 'চ্যাবন সার,' সেখানে থেকে স আর র জায়গা বদল করে চ্যাবন ঋষি।

এই চ্যাবন ঋষির পুত্রই হলেন শ্রীমান রত্নাকর। বাপ একজন ঋষিতুল্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হলে কি হবে পুত্র কিন্তু বইপত্রের ধার দিয়েও গেল না। ছোট থেকে বয়স বাড়তে বাড়তে শ্রীমান তার মায়ের আদরে এবং বাপের অপদার্থতার সুযোগে পুরোপুরিই বখে গেল। খেলে বেড়িয়ে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে দিন কাটত। বয়স আর একটু বাড়তেই শুরু হয়ে গেল বাপের পকেট মেরে পাওয়া পয়সায় বন্ধুদের সঙ্গে শহরের যত লঝঝড় মার্কা সিনেমা হলে সামনের সারিতে বসে বাদাম চিবাতে চিবাতে—'লুট আউর দাঙ্গা' কিংবা 'দিলো কী রানি' মার্কা ঝরঝরে সিনেমা দর্শন। সে সব সিনেমার নায়িকাদের কী সাঙ্ঘাতিক সব সাজপোশাক, নায়ক খল-নায়কদের সঙ্গে কী লোমহর্ষক রগড়া-রগড়ি।

নায়িকাদেরকে ওইরকম পোশাক পরা অবস্থায় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তো পাড়ার কুকুরগুলোও উত্তেজিত হয়ে চিৎকার শুরু করে দেবে। নেহাৎ তারা টিকিট কেটে সিনেমা হলে ঢোকে না তাই রক্ষে। আর রগড়া-রগড়ির বহর দেখলে মনে হবে ওদের গায়ে নর্থপোল সাউথ পোল ম্যাগনেট সাঁটা আছে। কাছাকাছি এলেই ঝটাক্‌সে টেনে নেয়।

এ হেন সব মারকাটারি সিন-সিনারি দেখতে দেখতে সারা শরীর গরম হয়ে ওঠে। চুল তো চুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত খাড়া হয়ে যায়। বয়সের ধর্ম। রত্নাকরদেরও তাই হত। ইড়া পিঙ্গলা জাগ্রত হয়ে চড়াৎ করে এমনি মাথায় উঠে যেত যে ওরা মাঝে মাঝেই এটা ওটা ছুতো করে সিনেমা হলের গেটের সামনে কিংবা কখনো কখনো ভেতরেই ঝাড়পিট শুরু করে দিত। এই করতে করতেই চোখ ফুটে গেল। বুঝে গেল বাবার লাইনে গিয়ে পড়াশুনা করা ওর পোষাবে না। ও লাইনে

মেহনত বেশি আমদানি কম। তার চাইতে এ লাইনটা অনেক ভালো। মজাও যেমন আছে তেমনি নানা বাহানায় মালকড়ির আমদানিও অঢেল।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি নকশাল আন্দোলনের ডামাডোলের মধ্যে রত্না একটা দল পাকিয়ে ফেলল। আর পায় কে? পাড়ায় বোমাবাজি, দোকানদারদের থেকে ভয় দেখিয়ে তোলা আদায়, না দিলেই পেটোর ঝাড়। অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে রত্নার দলের নাম শুনলে সাধারণ পাবলিক তো দূরের কথা পুলিশের পর্যন্ত বুক কেঁপে যায়। কনস্টেবল থেকে থানার বড়বাবু কেউই রত্নাকে ঘাঁটাতে চায় না। ডাকাতির জন্যে সাধারণ লোক থানায় ডায়েরি করতে গেলে বড়বাবু যদি বুঝতে পারে যে সেটা রত্নার দলের কাজ তবে আর ডায়েরি নিতে চায় না। আপোষে মিটমাট করে নেবার উপদেশ দেয়। মনে ভয় আছে, রত্নার সঙ্গে টক্কর মারতে গেলে যে কোনো সময় তার নিজেরই লাশ পড়ে যাবে। চোর পকেটমার খুনি গুণ্ডা বদমায়েসরা পুলিশকে ভয় করে, সেলাম বাজায়। কিন্তু রত্না হল অনেক বড় মাপের কাপ্তেন। থানার পুলিশই তাকে স্যালুট মারে।

পুলিশের তখন মুখময় গোবর। তারা জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা করবে কি, নিজেদের জানপ্রাণ নিয়েই টানাটানি। সহজে থানার বাইরে বেরোতে চায় না। বেরোলেও দল বেঁধে। কোথাও উপরতলার হুকুমে পুলিশ পিকেট বসাতে হলে অনেকে মিলে দল বেঁধে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে বসে বাপের নাম জপ করে। কাল গতিকে রত্নাই এখন বাপ।

কিন্তু বাপেরও বাপ থাকে। সেইরকম দুটি বাপ সে যাত্রা বঙ্গদেশের পুলিশকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। অবস্থা বিপাকে পড়ে বঙ্গবাসী পুলিশ যখন চোখে অন্ধকার দেখছে তখন বাইরের কোথা থেকে যেন বদলি হয়ে এল ইয়া তাগড়া দুই পুলিশ অফিসার। বাইরে থেকে বলতে বঙ্গদেশের বাইরে থেকে। সে যা চীজ, ওরকম স্যাম্পেল বঙ্গদেশের জলহাওয়ায় কোনোদিন তৈরি হয়নি, কোনোদিন হবেও না। বোধ হয় সর্দারজি টর্দারজি হবে। কিংবা পাঠানও হতে পারে।

আবার পুস্তু হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। সবটাই আন্দাজের ব্যাপার। আসলে তারা যে কী সেটা জিজ্ঞেস করে জানতে যায় কে? সকলেরই তো জানের ভয় আছে।

উঁচাই সাড়ে সাত ফুট। সেটা চোখে দেখেই বোঝা যায়। ওজনটা মাপা হয়নি। ওজন মাপতে যন্তর লাগে, সে যন্তর ওদের পায়ের নিচে বসাতে যায় কোন ইয়ে। অফিসে প্রথম দিনই বসতে গিয়ে ওদের দু'জনে দুটো কাঠের চেয়ার ভেঙে ফেলল। শুধু ভেঙেই নিস্তার নেই। চেয়ারের হাতগুলো নিতম্বের সঙ্গে এমনি আটকে গেল যে সেগুলো টেনে ছাড়াতে দুটো কনস্টেবলের গলদঘর্ম অবস্থা। তারপর ওদের জন্যে দুটো স্পেশাল মাপের লোহার চেয়ার বানিয়ে তাতে বসতে দেওয়া হল। লোহার চেয়ারে যুত করে বসে ওরা দু'জন যখন ফোঁস করে আরামের নিশ্বাস ছাড়ল তখন ঘরে ঝড় বয়ে গেল। টেবিলের উপরে রাখা খাতাপত্রগুলো তো বটেই এমনকি দোয়াতটা পর্যন্ত উড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এস আইয়ের মুখে ঠকাস করে ধাক্কা খেয়ে মুখময় কালি। বেচারা এস আই।

দু'জনের মাথাতেই ইয়া বড়া বড়া জটা আর মুখে ইয়া বড়া বড়া দাড়ি। মাথার জটা প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের স্টাইলে চুড়ো করে বাঁধা। দেখলে মনে হবে ওরা নিজের জন্মে তো বটেই বাপের জন্মেও কোনোদিন চুলদাড়ি কাটেনি। দু'জন্মের চুলদাড়ি একসঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছে। আর সেইসঙ্গে কতজন্মের উকুন তার কোনো আদম সুমারি নেই। চোখ দেখলে বোঝা যায় ভয়ডর কি জিনিস তা তারা জানে না। জানে শুধু ভয় দেখাতে। ওদের চোখের দিকে যে তাকাবে তার চোখ ব্রহ্মতালুতে উঠে যাবে।

আরো খবর নিয়ে জানা গেল ওরা এক-একবার খায় একশ চোদ্দোটা করে ডবল সাইজের রোটি। খবরটা পেয়ে বঙ্গদেশের পুলিশ অধিকর্তা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বুঝে গেলেন, এবারে রত্না ঠিক জব্দ হবে। বঙ্গ দেশের পুলিশ এতদিন রত্নাকে জব্দ করতে পারেনি তার কারণ রত্না যা খায় বঙ্গদেশের পুলিশও তাই খায়। শুধু কি তাই, রত্না খায় বাজার থেকে পয়সা দিয়ে কেনা টাটকা জিনিসপত্র আর পুলিস খায় প্রায় বিনা পয়সায় পাওয়া সরকারি রেশনের পুলিশি বরাদ্দ যতসব অখাদ্য ভুষি। ভুষি খাওয়া পুলিশ যে রত্নাকে কব্জা করতে পারবে না সেটা দেশের সরকার এতদিন বোঝেনি। এবার বুঝেছে বলে মনে হচ্ছে।

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে যাওয়া পুলিশ বিভাগের উপঅধিকর্তা চুপি চুপি বড় অধিকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন—স্যার, এই যে দু'জন পুলিশ অফিসার নতুন এসেছে এরা কি আই পি এস অফিসার?

এরা যে আসলে কী সেটা বড় অধিকর্তা নিজেও ভালো করে জানতেন না। প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ স্থির পাথরের মতো চোখ করে উপঅধিকর্তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—না, এরা আই পি এস নয়। এরা আই আই পি পি এস এস।

সেটা আবার কী জিনিস? উপঅধিকর্তা চুপচাপ বড় অধিকর্তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আর মনে মনে পুলিশ সার্ভিস কোডের আগাপাশতলা ঘেঁটে ঘেঁটে কথাটার মানে বার করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

উপঅধিকর্তার চুপসে যাওয়া মুখচোখ দেখে বড় অধিকর্তা নিজে নিজেই খোলসা করলেন—আই আই পি পি এস এস হল আই পি এস-এর বাপ। পুলিশ অবস্থা সামাল দিতে পারছে না দেখে সরকার তাদের বাপকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

—কিন্তু কথাটার মানে কি স্যার? এটা কোন ক্যাডার?

—হবে একটা কিছু। এই ধরো না কেন—ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল পেটারনাল পুলিশ স্পেশাল সার্ভিস ধরনের একটা কিছু।

উপঅধিকর্তা মনে মনে হিসেব করলেন, পেটারনাল পুলিশ মানে পুলিশের বাপ, সেটা না হয় মানা গেল। কিন্তু পেটারনাল পুলিশ মানে তো পেটানো পুলিশও হতে পারে। আর ওদের কব্জির যা জোর, দেখে মনে হয় একটা রদ্দা খেলে আর দু'নম্বরটা খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার হবে না। উপঅধিকর্তা সেইখানে বসেই মনে মনে ফয়সালা করে নিলেন। ওদেরকে কোনোক্রমেই ঘাঁটাতে যাবেন না।

শুধু চেহারা আর ওজনই নয়, নতুন আসা পুলিশ অফিসার দু'জনের নামেরও কি বাহার। সিনিয়ার জনের নাম সৃষ্টি স্থিতি বিনাশাচার্য ব্রহ্মানন্দ কঞ্চৌড়ী আর জুনিয়ার ভদ্রলোকের নাম নিত্যনারায়ণ পদাভিলাষী নরদানব পঞ্চৌড়ী। বঙ্গবাসী পুলিশের পুলিশ হলে কি হবে বাপ ঠাকুর্দারা তো পদাবলী কীর্তন গেয়ে বড় হয়েছে। কঠিন কঠিন কথা বলতে তাদের দৌড় ওই সাবধান, বিশ্রাম, বাঁয়ে মোড়, ডাইনে মোড়— এই পর্যন্ত। আবার কখনো কখনো চোর-পকেটমার ধরতে পারলে—শালা হারামজাদা কুত্তার বাচ্চা—এইসব। এর ওপরে তারা উঠতেই পারে না। তাই ওই দু'জনের তাগড়া চেহারাগুলো কোনোরকমে চোখে সহ্য করতে পারলেও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর চেহারাগুলো একেবারেই হজম হল না। উচ্চারণ করতে গিয়ে তাদের রসগোল্লা খাওয়া জিবগুলো এতটাই কেতরে গেল যে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে তারা পুলিশ অফিসার বলতে গিয়ে ফুলিশ অপিচার বলতে লাগল। ভাগ্যিস সেই সময় কেউ তাদের বাপের নাম জিজ্ঞেস করেনি। তাহলে তো সব্বার বাপের নাম এক ধারসে খগেন হয়ে বসে থাকত। নিজেরা বাঁচবার জন্যে তারা নামগুলো ছোট করে নিল। একজনের নাম হল ব্রহ্মা, অন্যজন নারদ। জাতে বাঙালি তো, সুন্দর সুন্দর নাম তৈরিতে সবাই ওস্তাদ। হাজার হোক দেশটা তো একা শ্রীচৈতন্যের নয়, রবীন্দ্রনাথেরও বটে।

ব্রহ্মা আর নারদের উপর ভার ছিল রত্না আর তার দলকে শায়েস্তা করার। কাজটা ওদের কাছে কিছুই নয়, একেবারে ডাল বরাবর। ইচ্ছে করলে স্রেফ রদ্দা মেরেই রত্নাকে তারাকাঠি দেখিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু ওরা সেটা চাইল না। ওদের উদ্দেশ্য দলবল সুদ্ধ রত্নাকে খাঁচায় পোরা। তার চাইতেও বড় উদ্দেশ্য ছিল রত্নার মনের পরিবর্তন করা। ওপর থেকে ওদেরকে সেই রকমই হুকুম দেওয়া আছে।

রত্নার সঙ্গে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে একদিন সন্ধের অন্ধকারে ব্রহ্মা আর নারদ দু'জনে স্রেফ দেহাতি মেয়েমানুষ সেজে গঙ্গার ধারে জেটিতে গিয়ে বসে রইল। টিকটিকির হাত দিয়ে রত্নার কাছে গোপন খবর পাঠানো হল ওইদিন ওইসময় ওইখানে দুটো মাইয়া মান্ষের মধ্যে অনেক টাকার নগদ লেনদেন হবে। সময় বুঝে ঝাপ্‌টা মারতে পারলে মালকড়ি ভালোই পাওয়া যাবে।

পুলিশ বিভাগের হাতে একরকমের টিকটিকি থাকে যারা শুধু রত্নার খবরই পুলিশকে দেয় না পুলিশের খবরও চালান করে রত্নার কাছে। এরা দু'দিক থেকে মাল খায়। পুলিশকে দেখায় রত্নার সঙ্গে মাখামাখি করছি ওর পেটের খবর বার করার জন্যে আর রত্নাকে বোঝায় পুলিশের সঙ্গে মাখামাখি তো ওরা কবে কোথায় 'রেড' করতে যাবে তার খবরটা আগেভাগে বার করে আনার জন্যে। এদের নাম দোগেড়ে টিকটিকি। রত্নারা এদেরকে বিশ্বাস করে আর পুলিশেরও এদেরকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। অনেক টাকার টোপ দিয়ে সেইরকম একটা দোগেড়ের হাত দিয়ে খবরটা চালান করা হল রত্নার কাছে।

দোগেড়ে গিয়ে রত্নাকে পাম্প দিল—এটা এক্কারে নিয্যস খপর। আফগানিস্তান থিকে নেপাল হয়ে ইণ্ডিয়ায় বডার পেরিয়ে এক প্যাকেট মাল এসে পৌঁছে গেছে কলকাতায়। মালের দাম কুন না এক কোটি তো হবেই। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে মালটা হাত বদল হবে দুটো মাইয়া মান্ষের মধ্যে। এ হল নগদানগদি কারবার। একহাতে মাল আর অন্যহাতে টাকা। ই খপর পুলিশের কাছেও নেই। এক্কারে ফাঁকা মাঠ। তোমরা গিয়ে সটটি মেরেচ কি নিয্যস গোল। খিঃ খিঃ খিঃ।

মর্ত্যলোক—৪

ব্রহ্মা বলিলেন—পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের কে হইবে ভাগী।।
—কৃত্তিবাস।

খবর মোতাবেক রত্না তার দলবল নিয়ে চুপিসাড়ে জায়গামতো হাজির হয়ে গেল। দূর থেকে আবছা অন্ধকারে দুটো মেয়েমানুষকে বসে থাকতে দেখে রত্নার এক চেলা তার কানে কানে বলল—ও গুরু। মাইয়া দুটো বসে বসেই এত উঁচা, দাঁড়ালে কতটা হবে? ওরা কি মান্ষের মাইয়া না রাবণের মাইয়া?

সে বেচারার আর দোষ কি? এমনিতেই সাড়ে সাত ফুট। মাথার ওপরে আবার দুজন্মের জটার চুড়ো। তার ওপর দিয়ে 'ঘুঙ্ঘট'। স্বয়ং বিধাতাও এত উঁচু মেয়েমানুষ তৈরি করার কথা কোনোদিন ভাবেননি। কোনোদিন ভাবেননি বলাটা অবশ্য ঠিক হল না। একবার ভেবেছিলেন। যখন তিনি রেবতীকে সৃষ্টি করেছিলেন। সত্যযুগে সৃষ্টি হওয়া রেবতীর উঁচাই ছিল পাক্কা আট হাত। রেবতীর বিবাহ হয়েছিল বলরামের সঙ্গে দ্বাপর যুগে। ততদিনে মানুষের উঁচাই নেমে এসেছে সাড়ে তিন হাতে। এখন মুস্কিল হল এই যে আটহাত উঁচু একজন মহিলার সঙ্গে সাড়ে তিন হাত উঁচু বলরাম সংসারধর্ম পালন করেন কী করে? কিন্তু বলরাম তো স্বয়ং ভগবানেরই আট নম্বর অবতার। তাঁর কাছে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়। তিনি তাঁর হাতের সেই বিখ্যাত লাঙলটি দিয়ে রেবতীকে ছেঁটে ছোট করে নিলেন। এরকম একটা সাঙ্ঘাতিক শল্যচিকিৎসা আজকালের সবচেয়ে বড় ডাক্তারেরও আয়ত্বের বাইরে। যাকগে, পাঠক-পাঠিকাদের জানা থাকলেও নকশালি মস্তানদের ওসব জানা থাকার কথা নয়। রত্নার সাকরেদের পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

ওদেরকে দেখে রত্নার মনেও যে একটু খটকা লাগেনি তা নয়। কিন্তু সে হল লীডার। মনের খটকা সাগরেদদের জানতে দেওয়া চলবে না। মুখে সাহস এনে বলল—আরে ওরা মানুষেরই মাইয়া। দিহাতি তো, তাই অত উঁচু। কিংবা হয়ত পেটে বাচ্চা আছে। নিজের উঁচাই আর বাচ্চার উঁচাই দুটো মিলে অতটা উঁচু দেখাচ্ছে। উসব ভেবে আর এখন লাভ নেই। চল্ অ্যাক্‌শনে নামি।

ওরা আস্তে আস্তে বৃত্ত ছোট করে আনল। ব্রহ্মা আর নারদ বসে বসে আড়চোখে সেটা দেখতে লাগল। আর এমন নাটক করতে লাগল যেন ওরা এদের দেখতেই পায়নি। ওরা নিজেদের মধ্যে লাখবেলাখের কথায় মশগুল। টাকাটা এই হাতবদল হল বলে।

হঠাৎই যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হল পাইপগান আর চপার হাতে জনাপাঁচেক ছোকরা। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ব্রহ্মা আর নারদ ভয় পাওয়ার ভান করে উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াতেই উঁচাইটা হয়ে গেল দু'গুনো। কী উঁচু! মুখের দিকে তাকাতে হলে আকাশের দিকে চোখ তুলতে হবে। মাথার ব্যাকগ্রাউণ্ডে চাঁদ থাকলে চাঁদ নক্ষত্র থাকলে নক্ষত্র। কথা বলার সুবিধের জন্যে রত্না দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল। তারপর দলপতি হিসেবে সেই হুকুমটা চালাল—মালকড়ি যা আছে সব হ্যাণ্ডওভার করো। নড়ার চেষ্টাটি করেছ কি লাশ পড়ে যাবে। মেয়েমানুষ বলে রেয়াত করব না।

ভয় পেয়ে গেলে প্রথমটা একটু চুপচাপ থাকতে হয়, তারপর তোতলে তোতলে কথা শুরু করতে হয়, সেটাই দস্তুর। ব্রহ্মাও তাই করলেন। গলায় অনেকখানি মাখন মাখিয়ে বললেন—বাপুহে, চাইছ যখন, সবই দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এই যে এত পাইপগান চালাচ্ছ পেটো ঝাড়ছ, ছিনতাই করছ, লাশ ফেলছ —এর শেষ ফলটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ? একদিন না একদিন তো পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই হবে। তখন কি হবে?

ব্রহ্মার মাখন মাখানো গলার স্বরটা কানে যেতেই রত্নার বুকটা আরেক দফা ধড়াস করে উঠল—বাপরে! মেয়ে মানুষের এ কী বাজখাঁই গলা! মাখন মাখিয়ে বলছে তাতেই এই। কাজিয়া করার সময় কীরকম ঢাক বাজাবে? এই রকম গলাওয়ালী মেয়েগুলোর সঙ্গে ওদের পুরুষগুলো প্রেম করে কী করে?

কোনোরকমে ঢোঁক গিলে রত্না বুকের ধড়াসটাকে ভেতরে চালান করে দিল। তারপর গলায় যতটা পারা যায় রোয়াব আমদানি করে বলল—ধ্যুস্ শালা। আমি রত্না আছি। নকশাল লীডার। আমাকে ধরবে এত হিম্মত পুলিশ ব্যাটাদের নেই।

—পুলিশ ব্যাটার না থাকতে পারে। কিন্তু পুলিসের বাপের তো থাকতে পারে।

রত্না পুলিশের বাপের কথা কোনোদিন শোনেনি। কিন্তু শোনেনি বলেই যে শুনে ঘাবড়ে যাবে সেরকম মশলা দিয়ে সে তৈরি নয়। একই রকম তেরিয়া গলায় বলল—পুলিশের বাপটা আবার কে র‍্যা?

—কেন, এই যে আমরা। বলেই ব্রহ্মা বিদ্যুৎ গতিতে রত্নার থুতনির তলায় গলানলির দু'পাশে দুটো আঙুল লাগিয়ে ওকে মাটি থেকে দেড় হাত

ওপরে ঝুলিয়ে ধরলেন। তাই দেখে পাশের সাগরেদটা চপার তুলল কোপ মারার জন্যে। নারদের হাতের একটা রদ্দা খেয়ে সে হাত দশেক দূরে ছিটকে পড়ে গিয়ে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। নারদ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য দুটো ছোকরার মাথায় মাথায় ঠুকে দিতেই তারা আকাশে অনেক নক্ষত্র টক্ষত্র দেখতে পেল আর সেই নক্ষত্রলোকের ভেতর দিয়ে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে ওখানেই শুয়ে পড়ল। শুল তো শুল শুয়েই রইল। উঠে দাঁড়াবার আর মুরোদ নেই। ওপাশের এক সাগরেদ ত্বরিত গতিতে পাইপগান তুলে ট্রিগার টিপতে গেল। কিন্তু তার আগেই সেটা উড়ে গিয়ে ছপাত করে গঙ্গার জলে পড়ে ডুবে গেল। ব্যাপার দেখে ছেলেটা অন্ধকারেই খ্যাঁকশিয়ালের মতো দৌড় লাগাল। কিন্তু কপাল মন্দ। দিশাহারা হয়ে সে তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। দিক ঠিক করতে না পেরে সে যেদিকে দৌড় লাগাল সেদিকে স্বয়ং মা গঙ্গা। ঝপাং করে ঝাঁপ দিয়ে যে ভাবে সে জলের মধ্যে পড়ল দেখলে মনে হবে সে তার হাতছাড়া হয়ে যাওয়া পাইপগানটার খোঁজেই জলে ঝাঁপ দিয়েছে। সময়টা মাঘ মাস। কালটা সন্ধ্যা। সে ছোকরা তার পাইপগানটা খুঁজে পাক বা না প্যাক তার গরম হয়ে যাওয়া শরীরটা একটু ঠাণ্ডা হবে আশা করা যায়।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এত যে সব ঘটনা ঘটে গেল রত্না কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সুযোগ পায়নি। ব্রহ্মার দু'আঙুলের আঁকশিতে সে তখন পেণ্ডুলামের মতো ঝুলছে। চোখদুটো প্রাণপণে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কানের মধ্যে হাজারখানেক শাঁখের বাদ্যি, নাক দিয়ে গরম নিশ্বাসের ঝড়, জিবটা জাঁতাকলে আটকে পড়া ইঁদুর আর ওদিকে পেটের মধ্যে ভীম আর দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ এমনই দুর্ধর্ষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে সেখানে ঢুকিয়ে রাখা মালপত্রগুলো সব তীব্রবেগে বেরিয়ে আসার জন্যে আকুলি বিকুলি করছে।

একই সঙ্গে রত্নার সবকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই একটা না একটা ধুন্ধুমার চলেছে। আর সবাই জানান দিয়ে দিচ্ছে যে এইরকমভাবে ধুন্ধুমার চলতে থাকলে তারা সবাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে। তখন কিন্তু আর কিছু করার থাকবে না। যাই হোক ভাগ্যগুণে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ব্রহ্মা তাঁর আঙুলের সাঁড়াশি আলগা করে দিয়ে রত্নাকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে যাওয়া অসাড় রত্না তড়িঘড়ি মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলল, লম্বভাবে নয় সটান লম্বা ভাবে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ব্রহ্মা আর নারদ রত্নাকে ধাতস্থ হবার সুযোগ করে দিলেন। ধাতস্থ হয়ে রত্না উঠে বসল। ব্রহ্মা বললেন—পুলিশের বাপের পরিচয় তো পেলে। এবারে যদি তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিই তো কেমন হয়? তারা তো তোমাকে প্রথমেই একচোট বেধড়ক ঠেঙিয়ে হাত-পা ভেঙে দেবে। তারপর জেলের ঘানির সঙ্গে জুতে দেবে। জীবনের বাকি কটা দিন সেই ভাঙা হাত-পা নিয়েই জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে। জিনিসটা কেমন লাগবে?

কেমন যে লাগবে সেটা রত্নার উল্টোপাল্টা হয়ে যাওয়া ঘিলুতে কিছুতেই গোছগাছ করা গেল না। সবকিছু কেবলই গুলিয়ে যেতে লাগল। সেই গুলিয়ে যাওয়া অবস্থাতেই রত্না শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারল যে এর মধ্যে কিছু একটা কষ্টের ব্যাপার আছে। আর সেসব কষ্ট সহ্য করার জন্যে বাপকে ডাকা ছাড়া গতি নেই।

নিজে কষ্টে পড়লে যে কোনো বঙ্গবাসীই খুঁজতে থাকে আর কে কে সেই কষ্ট ভোগ করছে। অন্যকে কষ্ট ভোগ করতে দেখলে নিজের কষ্ট নিজে নিজেই অর্ধেক হয়ে যায়। ভরসার কথা ওইটুকুই। রত্নারও ভরসা ওইখানে। ব্রহ্মার কথার উত্তরে সে চি চি করে বলল—আমি একা কেন? ওরাও তো আমার সঙ্গে ঘানি ঘোরাবে। ভাবখানা এই যে, সবাই মিলে হাত লাগালে কি জানি ঘানিটা সহজে ঘুরবে আর তাইতেই ওর কষ্টটা লাঘব হবে।

—ওরা কারা?

রত্নাকর সাগরেদদের দেখতে পাবার আশায় পিছন ফিরে চাইল। কিন্তু ভোঁ ভোঁ। সেখানে কেউ কোথাও নেই। সবাই কেটে পড়েছে। তার এত পেয়ারের সাগরেদরা তাকে একা বিপদের মুখে ফেলে কেটে পড়েছে দেখে বেচারা রত্নাকরের মুণ্ডুটা আর একবার ঘুরে গেল। নিজের বিপদের ছবিটা এখন যেন একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে। আর যতই স্পষ্ট হচ্ছে ততই যেন চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসছে। রত্নাকর খুব মুষড়ে পড়ল।

তাগড়া গুণ্ডাকে কোঁৎকা মারলে সে যখন চেত্তা খেয়ে কঁকাতে থাকে তখন সেটা পুলিশের কাছে বেশ একটা উপাদেয় জিনিস। সে জিনিসের স্বাদ ব্রহ্মা আর নারদের অনেক নেওয়া আছে। কিন্তু প্যাঁচে পড়ে সেই গুণ্ডা যখন মুষড়ে গিয়ে চুপ হয়ে যায় সেটার স্বাদ আলাদা। প্রায় স্বর্গীয় বলা যেতে পারে। সহজে মেলে না। ব্রহ্মা আর নারদ বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই স্বর্গীয় স্বাদটা উপভোগ করলেন। প্রথম ধাক্কাটা কাটার পর ব্রহ্মা বললেন—দেখলে তো হে, তোমার বন্ধুরা কেমন মানে মানে কেটে পড়ল! পাকে পড়লে কেউ তোমার বিপদের ভাগ নিতে আসবে না হে ছোকরা। উল্টে পাছে তুমি পুলিশের কাছে ওদের নামধাম আর গোপন ডেরার খবর বলে দাও সেই ভয়ে ওরা সুযোগ পেলেই তোমার লাশ ফেলে দেবার ধান্দায় থাকবে। তোমার এখন দু'দিকেই বিপদ। এদিকে পুলিশের কাছে বেধড়ক পিটিন। ওদিকে পেয়ারের সাকরেদদের কাছে পেটো। এই দু'মুখো বিপদ থেকে এখন নিজেকে কেমন করে সামলাবে সেইটে ভাবো।

রত্নাকর ভাববে আর কি? ভাবার জন্যে কিছুই তো আর বাকি নেই। গলাটা বেজায় শুকিয়ে গেছে। একটু জল পেলে ভালো হত। একবার মায়ের কথা মনে পড়ল। কিন্তু এই অন্ধকারে মা-ই বা কোথায়, জলই বা কোথায়? একটু দূরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেদিকটা আগলে দাঁড়িয়ে আছে যমদূতের মতো দুটো পাহাড় সাইজের পুলিশের বাপ।

শেষ পর্যন্ত কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে রত্নাকর পুলিশের বাপকেই নিজের বাপ বানিয়ে ব্রহ্মার পা-দুটো জড়িয়ে ধরল। আমাকে বাঁচান বাবা। আমি এখন কী করব আপনারাই দয়া করে বলে দিন।

রত্নাকরের দুরবস্থা দেখে ব্রহ্মার মনে করুণা হল। শুধু করুণাই নয়, মনে আনন্দও হল। এইটাই তো ওঁরা চাইছিলেন। রত্নাকরের মনের পরিবর্তন। ওঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার মুখে। ব্রহ্মা বললেন—বাপুহে, তোমার জন্যে এখন একটা পথই খোলা আছে। পারবে সেটা করতে?

—আপনি হুকুম করুন বাবা। নিশ্চয় পারব। শুধু পুলিশের হাতে ধরা দিতে বলবেন না। ওরা বড্ড পেটায়। একবার হাতের নাগালের মধ্যে পেলে পিটে ফাটিয়ে দেবে।

—না না। তোমাকে পুলিশের কাছে ধরা দিতে হবে না। তুমি বরং উল্টোটা করো। নও দো গ্যায়ায়া হয়ে যাও।

এতক্ষণে রত্নাকরের মনে যেন একটু আশার আলো ফুটল। লাইনের কথা এসে গেছে। বলল—ও হো, গ্যাঁড়াকল? ও আমি খুব পারব। বলুন কার কোথায় কী গ্যাঁড়া মারতে হবে। এক তুড়িতেই কাম ফতে।

—আরে না না। গ্যাঁড়া মারার কথা হচ্ছে না। নও দো গ্যায়ায়া মানে গ্যাঁড়া মারা নয়। ভেগে পড়া। পুলিশের হাতে পড়ে যদি ভোগে যাবার ইচ্ছে না থাকে তবে মানে মানে ভেগে পড়ো। এদেশ ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাও। যেখানে তোমাকে কেউ চিনবে না। ধরো পশ্চিমের দিকে কোনো দেহাতি জায়গায়। সেখানে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকো। সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে এদিকের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো থিতিয়ে আসবে। সবাই তোমার কথা

ভুলে যাবে। আর তারপর তুমিও ভদ্রলোকের মতো ঘুরে বেড়াতে পারবে।

ব্রহ্মা আর নারদের যুক্তি রত্নাকরের মনে ধরল। এছাড়া তার আর করারও তো কিছু নেই। সেই রাতেই রত্নাকর গঙ্গা পার হয়ে হাওড়া স্টেশনে গেল। একটা পশ্চিমমুখী ট্রেনে চেপে কলকাতা ছাড়ল। অবশ্যই ডাব্লু টি।

ওদিকে রত্নাকরের স্ব-আরোপিত স্বেচ্ছা নির্বাসনে বঙ্গমাতা হয়ে গেলেন রত্নহীনা। আহা বঙ্গের কী ভঙ্গ ভাগ্য!

মর্ত্যলোক—৫

অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্য মনোযথা।।

—*বাল্মীকি*

অনেকদিন ধরে অনেক ঘাটায় আর তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাটায় জল খেয়ে শেষ পর্যন্ত রত্নাকর এই তমসা নদীর ধারে এসে ডেরা বেঁধেছেন। কিশোর বয়সে যে রত্নাকর ছিল তুই তুমি—এখন বয়স হয়ে আর মুখময় চুলদাড়ি গজিয়ে তিনিই হয়ে গেছেন—আপনি আজ্ঞে। আহা কালস্য কুটিলা গতি।

ব্রহ্মা আর নারদ নামের দুই পুলিশের বাপের ঝাপড় খেয়ে যেদিন কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল সেদিন থেকেই রত্নাকরের চুলদাড়ি কাটা বন্ধ হয়ে গেছে। অনুপ্রেরণাটা এসেছিল ওদেরই চুলদাড়ির বহর দেখে। ওইরকম চুলদাড়ি আমাকেও করতে হবে। ওটাই কি জানি মহাশক্তির উৎস। বাপরে! ঝাপড়ের কী তেজ!

সেই সঙ্গে গলনলীতে ব্রহ্মার আঙুলের খোঁচা খেয়ে রত্নাকরের মাথার মধ্যে রাখা ঘিলুটাও নড়ে গেছে। তিনি এখন গুণ্ডামির ধারকাছ দিয়েও যান না। এখানে এসে গাঁয়ের দেহাতিদের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছেন। তমসা নদীর ধারে বেওয়ারিস জায়গাটা পেয়ে এখানেই ডেরা বেঁধে নিয়েছেন।

রত্নাকর আশপাশের গাঁয়ের ছেলেদের শেখান যোগাভ্যাস, সেইসঙ্গে কিছু ক্যারাটে আর জুজুৎসুর প্যাঁচ। এটাই ওঁর প্রাইভেট টিউশনি, গুরুকুল বিদ্যা। কিশোর বয়সে নকশালদের নেতাগিরি করার সময় উনি ক্যারাটে শিখেছিলেন সেই সঙ্গে কিছু জুজুৎসুর প্যাঁচ। তখন শিখতে হয়েছিল দায়ে ঠেকে। দায়ে ঠেকলে সম্বন্ধীও বাপ হয়ে যায়। গুণ্ডাপার্টির সর্দারি করতে গেলে শুধু ছুরি চালালে আর পেটো হাঁকড়ালেই হয় না, কিছু কিছু প্যাঁচ-পয়জারও চাই। নইলে চামচাদের কাছে মান থাকে না। তাই রত্নাকরকে চেষ্টা করে ওগুলো শিখতে হয়েছিল।

আসলে ক্যারাটে জুজুৎসু জুডো কুংফু এসব বিদ্যেগুলোও জাপানি, কথাগুলোও জাপানি। জাপানি ভাষায় ক্যারা মানে খালি আর টে মানে হাত। তার মানে ক্যারাটে হল খালি হাতে যুদ্ধ। ওদিকে আবার জু মানে ভদ্র আর জুৎসু মানে যুদ্ধ। তার মানে জুজুৎসু হল ভদ্রলোকের খালি হাতে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ। মোদ্দা কথাটা হল শত্রু আক্রমণ করেছে এদিকে হাতে অস্ত্র নেই। সে ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে এইসব বিদ্যে। ঠেকায় বেঠেকায় কাজ দেয় ভালোই। বিদ্যেটা রত্নাকরের যদিও ব্রহ্মা-নারদের মোকাবিলায় কোনো কাজে আসনি তবে অন্য অনেক রুস্তমকে রত্নাকর ওই বিদ্যে দিয়েই জব্দ করেছে।

গাঁয়ের ছেলেগুলো রত্নাকরের কাছে ক্যারাটে জুজুৎসু বেশ আগ্রহ নিয়েই শিখতে আসে। তাদেরও অনেকটাই দায়ে পড়া অবস্থা। তাদের হল ডাকাতের ভয়। অঞ্চলটা পুরোই বনজঙ্গলে ভরা। বড্ড ডাকাতের উপদ্রব। কথায় কথায় জান চলে যায়। ক্যারাটের প্যাঁচ শেখা থাকলে অন্তত কিছুটা সাহস। এই করেই দিন যাচ্ছে।

দিন কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা জিনিস হয়েছে। সেটা হল রত্নাকরের নামের পরিবর্তন।

তমসা নদীর ধারে আশ্রম বানাবার জন্যে রত্নাকর যে জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন সেখানটায় কোনো কাদাখোঁচা ছিল না। কাদার বদলে বালি, পরিষ্কার টলটলে জল একেবারে সৎ মানুষের মনের মতো নির্মল। সন্মনুষ্য মনো যথা।

ছোটবেলায় রত্নাকর বঙ্গদেশের গঙ্গায় তো দেখেছেন শুধু কাদা আর নোংরা ভর্তি ঘোলা জল। লোকে বলে গঙ্গা সর্ব কলুষ হারিণী। সত্যযুগে সেটাই ছিল দস্তুর। মানুষের মনের সব কলুষ ধুয়ে দিতেন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। কলিকালে এসে গঙ্গাদেবী এখন মানুষের মনের কলুষ কতখানি ধুচ্ছেন সেটা ঠিক মাপা যাচ্ছে না। তবে মানুষের তৈরি যাবৎ বর্জ্য দূষিত যে গঙ্গার জলে ধুয়েমুছে নিচের দিকে বয়ে যাচ্ছে সেটা মাপবার জন্যে স্কেল কম্পাসের দরকার হবে না, চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

হরিদ্বার হৃষিকেশে গঙ্গা খুব খরস্রোতা। ময়লা ধুতে এক তুড়ির ওয়াস্তা। কিন্তু বঙ্গদেশে এসে বেচারি বুড়ি মায়ের আর ততটা জোর নেই। ওপর থেকে যা কিছু ময়লা বয়ে এনেছে সেগুলো এখানেই দু'পাড়ে জমা করে দিচ্ছে। যাও বা কিছু কিছু অতিকষ্টে নিচের দিকে যায় সেটাও আবার জোয়ারের ঠেলা খেয়ে ওপর দিকে উঠে আসে। ময়লা আর কমতে চায় না।

এইসব কাণ্ড-কারখানার ফলে বঙ্গদেশে মা গঙ্গার জল আর স্বচ্ছ নেই। রংটি হয়ে গেছে ঘোলাটে লাল। আর কলুষ নাশ? পুণ্য অর্জনের শুভ কামনায় রামকেষ্টপুরের ঘাটে একবার ডুবটি দিয়েছ কি শরীরের নয়টি রন্ধ্র দিয়ে গল গল করে ঢুকে যাবে উজান গঙ্গার মহাত্মাদের দেহ নিঃসৃত পবিত্র বর্জ্যরাশি। সে বর্জ্যরাশির ঠেলায় এখন তোমার কলেরা হবে কি ম্যালেরিয়া হবে সেটা দেখার দায়িত্ব মা গঙ্গার নয়। তকদির আপনা আপনা।

এইরকম ঘোলাটে জল দেখে অভ্যস্ত রত্নাকরের পক্ষে পরিষ্কার টলটলে তমসা নদীর জল দেখে ভালো লেগে যাওয়ারই কথা। হলও তাই। রত্নাকর তমসা নদীর ধারে ডেরা বেঁধে রয়ে গেলেন। কালে কালে ডেরার নাম হয়ে গেল আশ্রম।

কিন্তু এইরকম বালিওয়ালা জায়গায় ডেরা বানাবার ফলে একটা অন্য ঘটনাও ঘটে গেল। গাঁয়ের লোকেরা ওঁকে বালিবাবু বলে ডাকতে লাগল। আর সময়ের অগ্রগতিতে ওঁর মুখে ঋষির মতো চুলদাড়ি বেড়ে ওঠার সঙ্গে তাল রেখে মানুষের মুখে মুখে নামটা হয়ে গেল বাল্মীকিমুনি। তাদের ছেলেদের মাস্টারের নাম বাল্মীকি মুনি।

মুখে চুলদাড়ি গজিয়ে রত্নাকর যদি বাল্মীকিমুনি হতে পারে তবে গাছ গাছালির বাগান দিয়ে ঘেরা ডেরাটারই বা আশ্রম হতে বাধা কোথায়? স্রেফ কণ্ঠি পরে নাকে তিলক কেটে বোষ্টম হয়ে গেলেই ভাত হয়ে যায় অন্ন, তা এ তো একমুখ পাকা পাকা চুলদাড়ি—তাও আবার তেল-চিরুনি ছাড়া।

লোকের মুখে অবশ্য নিজের বালিবাবু নামটা শুনে উনি প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেছিলেন। লোকে কি ওঁকে বাঙালি বলে চিনে ফেলেছে নাকি রে বাবা! তাহলে তো পুলিশের কাছে খবর চলে যাবে। আর ধরা পড়লেই কলকাতা। লকআপের মধ্যে পুরে বেধড়ক ঠ্যাঙানি। উঃ! ভাবাই যায় না। পরে অবশ্য আসল কথাটা জানার পর ভয়টা কাটল। লোকে ওঁর বালিয়াড়ির ডেরা দেখেই নাম দিয়েছে বালিবাবু, অন্য কোনো মতলব নেই।

সেসব হয়ে গেল অনেকদিনের কথা। এখন মুখের ভূগোল বদলে নাম পাল্টে রত্নাকর, মানে আরকি বাল্মীকিমুনি বহাল তবিয়তেই আছেন।

কিন্তু ওই যে, তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে। বাল্মীকির বেলায় ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল। তুমি ছাড়লে বঙ্গ কপাল ছাড়ে না সঙ্গ।

সে আর এক জবরদস্ত কাণ্ড। কেলেঙ্কারি বললেও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। তবে কাণ্ডই হোক আর কেলেঙ্কারিই হোক ঘটনার ফলটা হয়েছিল মারাত্মক।

[ক্রমশ]

রাশি চক্কোর

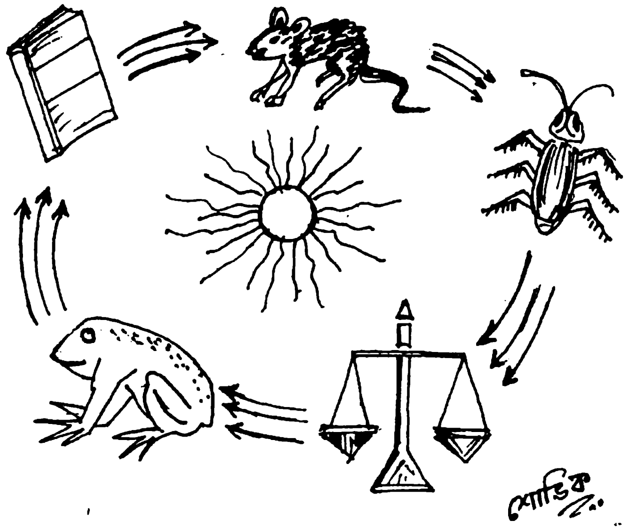

জ্যোতিষসাস্ত্রী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

কাব্যগ্রন্থ রাশি : আপনার বিজয়-যাত্রা এই মাসে সাফল্য লাভ করবে। বইমেলায় যদিও একটি কপিও কাটতি হবে না তবু সেই ঘাটতি সম্পূর্ণ মিটবে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর। একটিও পড়ে না থেকে আপাদমস্তক বাণ্ডিল রূপে বিক্রীত হয়ে আপনার প্রভুকে কিঞ্চিৎ অর্থ-দর্শন করাবে; অবশ্য ওজন দরে।

যৌন উপন্যাস রাশি : যে যে প্রেমিক প্রেমিকাকে তেমন করে স্পর্শ করার সুযোগ পাচ্ছে না তাদের হাতে আপনি প্রথমে শোভিত পরে প্রেমিকাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উপহার প্রদত্ত হতে পারেন। তবে শুক্র বক্র থাকায় প্রথমে প্রেমিকার বমন যোগ এবং পরে আপনার দ্বারাই প্রেমিক-প্রবরের মস্তক বিদীর্ণ করণের আশু সম্ভাবনা আছে।

বৃদ্ধস্য উপন্যাস রাশি : অবসর গ্রহণের পর যাঁরা নিতান্তই কাজকম্মো না পেয়ে একের পর এক উপন্যাস প্রসব করে গেছেন তাঁদের উপন্যাস সমগ্র বইমেলায় বসার পিঁড়ির পরিবর্ত হিসেবে বিক্রি হতে পারে, জলের দরে নয়, ইটের দরে। পরবর্তীকালে পাকশালে অগ্নিযোগ ও বাচ্চার দুধ-গরম দশা প্রকট।

কাব্য-সমগ্র রাশি : অতি উৎসাহে বউয়ের গহনা বিক্রি করে যাঁরা আপনাকে ছাপিয়েছেন হাজার দরে কিন্তু একজনও পড়ছে না বলে ব্যাজার হয়ে আছেন, তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন—একজন পাঠক অন্তত ঘাপ্‌টি মেরে আপনার স্তূপের মধ্যে বসে আছেন, নীরবে কবিতার ওম্ নিয়েই যাচ্ছেন; তিনি একটি কোলা ব্যাঙ।

প্রবন্ধগ্রন্থ রাশি : আপনি খুবই কাটবেন, ভীষণভাবে কাটিত হবেন, তবে কিঞ্চিৎ প্রাচীণ পদ্ধতিতে। অর্থাৎ ইঁদুর এবং আরশোলার দ্বারা। যত বেশি পুরনো হবেন ততই আপনার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, পুরনো বই ইঁদুরে কাড়ে।

লিট্‌ল ম্যাগ রাশি : আপনার এ মাসে ভ্রমণ যোগ আছে। বাণ্ডিল বেঁধে বইমেলায় বেড়াতে যাবেন। বারোদিন পবিত্র বই-সাগর মেলা ধূলিস্নান সেরে সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করবেন। মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র—সব গ্রহই আপনার প্রতি প্রসন্ন থাকায় আপনার গৃহহীন হওয়ার কোনো আশঙ্কাই নেই।

বিভাব-অনুষ্টুপাদি রাশি : লিট্ ম্যাগ জগতে যা রতি ইত্যাদি ভাবের উদ্বোধক বইমেলা কিংবা পাতিরাম-এ তারই নাম হন আপনারা। কিন্তু আয়তনে লিট্ না হয়ে থান ইট এবং মূল্যে ন্যুন না হয়ে বহুগুণ হওয়ার ফলে মধুর রস সুদূরগামী হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবে না-পড়া পাঠকের মুখে বহুগুণ-গান শ্রবণে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন।

পাঁজি রাশি : বিজ্ঞান ও আধুনিকতার রমরমাতেও আপনার কাটতি অব্যাহত থাকবে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সমাজে। আপনার চমক যোগ থাকায় এ মাসে এক ডিস্কো-থেক মার্কা তরুণ-তরুণীকে বইমেলায় আপনার পাতা ওল্টাতে দেখবেন। আনন্দ সাগরে ভাসতে ভাসতে বুকের বাঁদিকে খট-যোগ যখন শুনবেন তারা সেই দিনক্ষণ খুঁজছে, যখন আপনাকে বিদেয় করা যায়।

বঙ্গভারতীর রঙ্গদর্শন

সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

আজকাল আমাদের দেশে বিশেষ করে এই বঙ্গে সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে কেউই বিশেষ মাথা ঘামাবার ফুরসৎই পায় না, অথবা মাথা ঘামানো বাহুল্য মনে করে। চতুর্দিকে জড়তা—ভালো লিখলেও যা মন্দ হলেও তা। ভালো হলেও কেউ তা নিয়ে আলোচনায় বসে না, মন্দ হলেও তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। রবি ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন, 'চর্তুদিক ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছুই নাই। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন চিহ্নিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহা সত্ত্বলোকের দ্বারাই সম্ভব।' আজকের অবস্থাটা ঠিক সেইরকম। তা না হলে দেখুন আজকের বাংলার সাহিত্যের জগতে যে সব কুৎসিৎ বিবমিষা উদ্রেককারী কাণ্ড ঘটছে তা নিয়ে কোথাও একটু নড়াচড়া নেই। আজকে একজন বঙ্কিমচন্দ্র না হয় নেই— অন্তত কয়েকজন সজনীকান্ত দাশ থাকলেও শুনতে পেতাম—লেখক ছোকরা বা ছুকরীকে সম্মুখে পাইলে চড়াইতাম। তাবড় তাবড় প্রাতিষ্ঠানিক কাগজের দৌলতে যুগান্তকারী বৈপ্লবিক সৃষ্টির উন্মাদনায় উপন্যাস নামধারী এমন জিনিসও প্রকাশিত হয় যার কৌৎসিত্য সর্বকালের সর্বদেশের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। নগ্ন নারীদেহের ও মানব-মানবীর আদিম লীলার এমন বমন উদ্রেককারী সাহিত্যিক সৃজন ক্ষমতা ইতিপূর্বে আমার মতো অধমজনের চোখে পড়েনি। শ্লীলতা-অশ্লীলতার পুরনো তর্কে যাব না। এটাও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা, অতি সাধারণ রুচির কথা— যে কথার জন্যই আমরা নতুন কিছু করার নামে পথে উলঙ্গ হয়ে বেরুই না। যে বেরোয় তাকে উন্মাদ বলে উপেক্ষা করে যাই না—তার স্থান হয় পুলিশের গারদে, সেখান থেকে উন্মাদ আশ্রমে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আজকের এই জড়ত্বের যুগে সেই পাগলা বা পাগলীকেআমরা ঘুরে বেড়াতে দিই, তাকে যারা নাচায় তাকেও কিছু বলা বাহুল্য মনে করি, এমনই আমাদের উদার উপেক্ষা!

আজকে একজন বঙ্কিমচন্দ্র না হয় নেই— অন্তত কয়েকজন সজনীকান্ত দাশ থাকলেও শুনতে পেতাম—লেখক ছোকরা বা ছুকরীকে সম্মুখে পাইলে চড়াইতাম।

পণ্ডিতেরা বলেন ইউরোপ থেকেই নাকি আমাদের এই আধুনিক উপন্যাস আমদানি করা হয়েছে। সেই ইউরোপের উপন্যাস স্রষ্টা ও তত্ত্ববিদরা প্রায় সকলেই বলেছেন, উপন্যাস হল বাস্তব মানুষের অভিজ্ঞতাপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ। বাস্তব জীবনের অনুকরণ সম্পর্কে নতুন ধারণা আনবার চেষ্টা করলেন ফরাসী উপন্যাসের কয়েকজন তাত্ত্বিক শিল্পী—গুস্তাভে ফ্লবেয়ার (১৮২১—১৮৮০), গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় (১৮২২—১৮৯৬ এবং ১৮৩০—১৮৭০) এবং এমিল জোলা (১৮৮০—১৯০২)।

বাস্তবের অনুকরণ সম্পর্কে ফ্লবেয়ারের বক্তব্য হল, শিল্পীকে এমন ভাবে চরিত্র ইত্যাদিকে সাজাতে হবে যাতে কখনোই বোঝা না যায় এদের পেছনে কোনো লেখকের কোনো অস্তিত্ব আছে। এই নতুন বাস্তবতাবাদের প্রবক্তা ফ্লবেয়ার জীবন যেরকম হুবহু সেইরকম করে তাকে আঁকবার চেষ্টা করলেন তাঁর উপন্যাস মাদাম বোভারী (১৮৫৭) ও লা এডুকেশন সেন্টিমেন্টাল (১৮৬৯) -এ। সেখানে অনেক খোলামেলা কথা আছে কিন্তু সবকিছু খুলে নগ্ন মানব-মানবীকে দেখতে ও দেখাতে চাননি। শেষ পর্যন্ত তিনি টুর্গেনিভকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন, বাস্তবতাকে শুধু দেখাটাই বড় কথা নয়,

দেখা জিনিসগুলোর মধ্যে একটা রূপ আনা, একটা শৃঙ্খলা গড়ে তোলাই হল আসল কাজ। এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটি তিনি হারাননি।

বাস্তবানুকরণের চূড়ান্ত রূপ নিয়ে এলেন ন্যাচারালিস্ট বা প্রকৃতিবাদীরা। এর প্রথম সার্থক প্রবক্তা হলেন এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)। তাঁরা বললেন, বাস্তবকে নিয়ে আমাদের কাজ শুরু, সেটাই হল আমাদের ভিত্তিভূমি। 'We must modify nature, without departing from nature'। বাস্তবকে বিকৃত না করেই বাস্তবের রূপান্তর ঘটাতে হবে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'জারমিনাল'-এ বাস্তবকে যথাযথ রেখে তাঁর মতবাদকে পরীক্ষা করলেন। সেখানেও উলঙ্গ বাস্তবতার কোনো লক্ষণ আমরা দেখলাম না।

পরবর্তীকালে প্রকৃতিবাদীদের অন্ধ অনুকরণে বাস্তবকে হুবহু তুলে ধরবার নেশায় আক্রান্ত হয়ে উপন্যাসে দেহতত্ত্বর কড়চা লেখা আরম্ভ হয়েছিল ইউরোপীয় সাহিত্যে। কিন্তু পর্ণোগ্রাফি ছাড়া কোনো যথার্থ লেখকের হাতে উপন্যাসের নামে মানব-মানবীর আদিম প্রবৃত্তির নগ্ন বিবরণ রূপ রস বর্ণ সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। এমনকি অতি আধুনিক কালের রোমাঞ্চ সৃষ্টিকারী দুঃসাহসী ফ্রেডরিক ফরসিথ, সিডনী শেলডন এবং হ্যারল্ড রবিন্সের মতো লেখকবৃন্দও সে কাণ্ডজ্ঞান হারাননি।

সেই কাণ্ডজ্ঞান হারানোর বিশ্বরেকর্ড আমাদের এই জড়তাগ্রস্ত বাংলা সাহিত্যের জীবন-রঙ্গমঞ্চে এক বৈপ্লবিক সাহিত্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বাধীনে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী এক তথাকথিত উন্মত্ততাগ্রস্ত সাহিত্যসেবীর হাতে।

সেই নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাধরের হাতে ইউরোপীয় ন্যাচারেলিজ্‌ম যেমন নতুন ব্যাখ্যা লাভ করে নবতর রূপ লাভ করেছে তেমনি সুপ্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের রসবাদেরও নব রূপায়ণ ঘটেছে। আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'র রসসূত্রে আছে—'বিভাবানুভাব ব্যাভিচারী সংযোগাদ্ রস নিষ্পত্তি।' বিভাব অনুভাব ব্যাভিচারী ভারের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি। রসের সৃষ্টিতে এই প্রতিভাধরের ব্যাখ্যায় ব্যাভিচারী ভাব হল ব্যভিচারী আচার আচরণ—মানব-মানবীর আদিম প্রবৃত্তির নগ্ন রূপের অকৃত্রিম বিবরণ দান। এইখানেই তাঁর বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী প্রতিভার সবচেয়ে বড় অবদান। কারণ কেউই যেখানে পদচারণা করেননি, তিনি সেকাজ করেছেন। আলেকজাণ্ডার পোপ তাঁর Essay on Criticism-এ বলেছিলেন—For fools rush in where angels fear to tread. দেবতা যেখানে পদচারণায় ভয় পায় সেখানে বোকারা ছুটে যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই প্রতিভাধর তথাকথিত বোকার আবির্ভাবে আরো কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে ভবিষ্যতে, তা বলা যায় না। অবিলম্বে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে আরো কত দুর্গতি বঙ্গভারতীর কপালে আছে কে জানে!

কাঙালি

সৌরেন বসু

বাঙালীরা ভালোবাসে মিষ্টি
সত্যি কত সে করি লিষ্টি—
সীতাভোগ মিহিদানা
বোঁদে দানাদার খা না
নিখুঁতি কি অপরূপ সৃষ্টি!

খাজা গজা দরবেশ
রকমারি সন্দেশ
নারকেল-নাড়ু মোয়া মুড়কি;
ছানার পায়েস আহা
পেঁড়া ও গুজিয়া তাহা
বাতাসা রে ও-নলেন গুড় কি!

সরভাজা পানতুয়া
রসবড়া মালপুয়া
মিছরি ও ক্ষীর সোনপাপড়ি;
রাজভোগ বালুসাই
চিনি কালাকাঁদ চাই
চমচম ল্যাংচা ও রাবড়ি।

আহা রে কত সে ভোগ
বাদশা, শান্তিভোগ
চিত্রকূট ও রসগোল্লা;
ক্ষীরমোহনের পাশে
চন্দ্রপুলিও আসে
সরপুরিয়াও দেয় তোল্লা।

কে বলে বাঙালি ভেতো
লিস্টিটা দেখে নে তো
বলিস তো মুখে আসে যা খালি,
হয়ে যাবে সব ফাঁকা
পকেটে ও ট্যাঁকে টাকা
আধুলি ও সিকি যত ভাঙালি
মিষ্টি কিনতে আহা
বাহবা বাহবা বাহা
বাঙালিরা মিষ্টির কাঙালি।

হাজার রাজার বাজার
২য় তরঙ্গ

অলোক বসু

বেশ কয়েক বছর আগে অধুনালুপ্ত এক পত্রিকার তরফ থেকে বইমেলা উপলক্ষে এক অসম্ভব নামকরণের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ভদ্রলোকের নাম ঠিক মনে নেই। তবে তার অসম্ভব নামকরণটি মনে আছে— 'ছোটদের কামশাস্ত্র।' এই কথাটা মনে পড়ল সেদিন অটোর পেছনে কিছু কিছু লেখা দেখে। যদিও সে সব লেখা ঠিক অসম্ভব না হলেও কৌতূহলকর বটে। বাসে, লরিতে অটোতে নানান কথা লেখা থাকে— যেমন টা টা বাই বাই— দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি ইত্যাদি। গড়িয়া টু গড়িয়াহাট রুটের এক অটোর পেছনে ভুল বানানে লেখা আছে—তুমি নদী, আমি ঢেউ, তুমি কুত্তা আমি ঘেউ। কোন কবির রচনা জানা সম্ভব নয়—তবে যথেষ্ট চোখ টানে—এমনিও, ভুল বানানের জন্যেও। 'কুত্তা' হয়েছে 'কুত্যা'। সেসব যাই হোক, অটোতে যেতে যেতে ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকার সময় এ সম্বন্ধে এক গল্পও শোনা গেল। কোনো প্রাইভেট বাসের গায়ে নাকি লেখা ছিল—মামণি—ইত্যাদি। এর পরে নাকি সেলুন-সম্পর্কিত কিছু কথা লেখা ছিল। কথাগুলো এমনিতে খুবই নির্দোষ। কিন্তু যেহেতু মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বলা ছিল অতএব রচনাকারী বা লিপিকরের কু-মনোভাব ছিল বলেই মনে হয়। কোনো থানার পুলিশ ঐ বাসটাকে কি এক আইনে ধরে। তারপর ড্রাইভার কিংবা কন্ডাক্টরকে দিয়ে বাসের মালিককে ডেকে পাঠায়। বাস মালিক এলে নাকি তাকে কিছু আর্থিক জরিমানা তো করাই হয় এবং মবিল মেশানো কাপড় দিয়ে ঐ লেখা মুছতে বাধ্য করা হয়। বেচারী বাসমালিক আর কি করেন! বাসকে শোধন করতে হয়! ঘটনাটা সম্পূর্ণই অটোতে বসে শোনা অটো-কাহিনী। সত্য-মিথ্যা বলা মুশকিল।

তা এরকম নানান লেখার ছড়াছড়ি আমরা দেখতে পাই। গলানো সোনা আঠাশ টাকার বিজ্ঞাপনে 'গলানো সোনা' নিয়ে অনেকে অশ্লীলতাও করেছে। তা এসব লেখাকে একধরনের সাহিত্য বলা যেতেই পারে। আজকাল তো অনেকেই বাংলা ভাষার বিজ্ঞাপন হোর্ডিং— এসব নিয়ে বেশ মাতামাতি করে থাকেন। দু'একটি হাতে-গোনা ব্যতিক্রম বাদ দিলে এসব বিজ্ঞাপন কিন্তু সেক্ষেত্রে ভীষণভাবে বাংলাভাষী। খাতির বাড়িতে, ব্যবসা গাড়িতে—এসব লেখাগুলো অবশ্য সহজ কথায় অনেক মুখে বেধে যাওয়া গভীর কথা বলে দেয়। এক অত্যুৎসাহী সেই অটো-আলোচনায় বলেছিলেন, এরা তো দু-এক কলি রবীন্দ্রনাথ লেখালে পারে! তা পারে। রবি বুড়োর থেকে কিছু ধার করাই যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সেইসব কপিরাইট সংরক্ষণ-প্রবণ মহা মহা মণীষীদের, যারা ভীষণভাবে কুপিত, ব্যথিত এবং শেষমেষ 'চুপিত' (চুপই তো!) হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁরা এইভাবে অটোর পেছনে রবীন্দ্রসাহিত্য দেখলে হয়ত 'ফোটো' হয়ে যেতে বেশিক্ষণ সময় নেবেন না! হাজার হোক তাঁরাই তো পৃথিবীতে এক এবং একমাত্র রবীন্দ্রবোদ্ধা! তবে দিনকাল যা পড়েছে, রবি ঠাকুর থেকে বেশি কপি করা শুরু করলে টিভি সিরিয়ালের ভূতের মতো রবিবুড়ো আবার হাত বাড়িয়ে বলবেন না তো—দেখলে হবে! খরচা আছে!

রবিকে যদিও আমরা প্রচুর খরচা করেছি। তবুও তিনি এতই অসীম যে কোনোদিনই ফুরোন না!

বোধহয় নামকরণ বা এরকম লেখা থেকে আমরা একটু দূরে সরে যাচ্ছি। আজকাল আবার নানান জায়গায় নানান রকম নামকরণ হচ্ছে! মেয়ের সঙ্গে কথায় বাবা সেদিন 'ভিজে'দের

সম্বন্ধে জানলেন। সত্যিই অনেক জেনে গেলেন। তাঁদের সময় অনেক নায়িকা কেঁদে পর্দা ভেজাতেন—এরকম নাচন-কোঁদনে ভিজোতেন না। মেয়ে সেদিন এক সরুমতোন খ্যাংরাকাঠি মাংসহীনাকে দেখিয়ে বলল—এ হল ভিজে! বাবা অবাক—ভিজে কিরে! এতো রীতিমতো শুকনো!

—আরে না না, সে ভিজে নয়—এ হল ভিডিও জকি—যারা এসব প্রোগ্রামের পরিচালনা করে।

বাবা ভারী আপ্লুত হলেন! সত্যিই তো! কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম্ না! নামকরণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দেখা যায় যাদবপুর সন্তোষপুর এলাকায় এক ফ্রিজের দোকানের নাম 'Cold Reception' হলেও গড়িয়াহাট অঞ্চলে এক ফ্রিজের দোকানের নাম হল গিয়ে 'Frigid!'

(২)

ইদানীং নানানভাবে অফিসে হাজিরায় কড়াকড়ি, কর্মসংস্কৃতির জোয়ার! মন্ত্রীদের নরমগরম বিবৃতি, কর্মচারীদের বিরক্তি ইত্যাদি বেশ ব্যাপারটা জমিয়ে দিয়েছে। অনেক অফিসে অফিসাররা মাত্র একদিন না এলেই অ্যাবসেন্ট করে দিচ্ছেন! তা এক সরকারি অথবা আধাসরকারী ডিপার্টমেন্টে জনৈক মহিলা পাশের ডিপার্টমেন্টে নাকিসুরে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন—দ্যাখো না, মাত্র একদিন আসেনি, তাতেই কাজ দেখাচ্ছে। ঐ সরকারি ডিপার্টমেন্টে জনৈক সাধারণ নাগরিক কিছু একটা কাজে গেলে তিনি ঐ মহিলার অভিযোগ শুনছিলেন। এছাড়া ঐ ভদ্রমহিলার আরো অভিযোগ ছিল, তাঁকে জব্দ করতে নাকি টেলিফোনে কে বা কারা তিন তিনটে তালা মেরেছে! একজন বলছিল—সত্যিই! এটা ঠিক হচ্ছে না!

সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলা ফুঁসে উঠলেন—ইয়ার্কি মেরো না!! একে মাথার ঠিক নেই! হঠাৎ সেই মহিলার কি যেন মনে পড়ে যায়—এ্যাই—কি ভাবলে ব্যাপারটা?

—কি আবার ভাবব? সারাজীবন তো ভেবে ভেবেই গেল!

—না-না, ঐ মেয়েটা কিন্তু খারাপ নয়।

—আরে মেয়েরা কবে খারাপ হয়েছে! যাকগে, বলুন আজকে কি টিফিন আনলেন?

অঙ্কন-শিল্পীদের জন্য

যাঁরা কোথাও আঁকার কল্কে পাচ্ছেন না, একমাত্র তাঁরাই যোগাযোগ করুন। আপনার আঁকার বিনিময়ে পত্রপাঠ একমাত্র দাঁতখিঁচুনি ছাড়া আর কোনো পারিশ্রমিকই দিতে পারবে না। ভেবে যোগাযোগ করবেন।

বইমেলা ২০০৩, স্টল নং : এস-২৯৪

—আরে, ঐ টিফিন করে দেবার জন্যই তো বলছি!

—না বাবা, ঐ ক্যান্টিনই যথেষ্ট!

—বয়স হয়ে গেলে টের পাবে। বুঝতে পারবে তখন কি ভুল করেছ!

—তখন নাহয় বলা যাবে ঐতিহাসিক ভুল!

—কি আমার জ্যোতি বসু এলেন! ঐ কথা শোনার লোকও পাবে না!

এমন সময় বেরসিকের মতো পিওনের আবির্ভাব—দিদি ডেসপ্যাচে অনেকক্ষণ থেকে লোক এসে বসে রয়েছে। বড়বাবু ডাকছে—

—ঐ অ্যাক্ হয়েছে। দু'দণ্ড যে কথা বলব তার উপায় নেই!

—সত্যিই তো! কি নিদারুণ দুঃখ। চাকরি ছেড়ে চলে যান— কিংবা ঘাসুড়ে দিদির মতো প্রতিজ্ঞা করুন, যদ্দিন এই বড়বাবু থাকবে ফাইল ছোঁবনা—চুল বাঁধবনা।

—ফাজিল! বলে মহিলা নির্গত হলেন নিজের ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশে। সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'জন মহিলা এলেন অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে সামান্য গল্প করতে। শাড়ির ঝলকে ঝলকে যেন ধেড়ে বিজয়ের শাড়ির প্রদর্শনী! তারাও এসে টেলিফোন সংক্রান্ত নালিশ শুরু করলেন। সব শুনেটুনে একজন ভারী বিবেচক ভঙ্গিতে বললেন—বরং মোবাইল নিয়ে নিন—রিলায়েন্স আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করেই বোধহয় জলের দরে মোবাইল দিচ্ছে।

—সত্যি!—অন্য একজন বলে—সারাদিন এভাবে অফিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে একটু ফোনালাপ না করা গেল! সত্যি এই চাকরি আর জীবনে ধিক! শত ধিক!

তা শুনে অন্য একজন বলে ওঠে—'তা ঠিক! আপনারা সারাদিন এঘর ওঘর ঘুরে এত মোবাইল হয়ে থাকেন যে আপনাদের চেয়ার আপনাদের জন্যে কাঁদেন! এজন্যই আপনাদের হাতেই মোবাইল মানাবে ভালো।

অন্য একজন বলে ওঠে—ওনারা চেয়ারের থোড়াই কেয়ার করেন। ওনাদের পেয়ারের রাজনৈতিক দাদারা ওনাদের শিখিয়েছেন— কেবল চরৈবেতি— চরৈবেতি— একদম চেয়ারে বসে থেকে জীবনটাকে স্থাবর করে দেওয়া ঠিক নয়।

—ঠিকই। ওনারা সবাই ভীষণ মোবাইল। কিন্তু এইজন্যই ফাইলগুলো আর মোবাইল হয় না! এ ব্যাপারে ছেলেমেয়ে সবায়ের ভারী মিল!

একজন খেপলেন—একদম ইয়ার্কি মেরো না! তোমরাও কিছু কম নয়।

—তা ঠিক, তবে আপনাদের দম তো আমাদের নেই—তাই আমরা চেয়ারে ব্যোম মেরে বসে থাকি!

মোবাইল আলোচনা থামে। ধেড়ে বিজয়ের শাড়ি-সুন্দরীরা স্থান ত্যাগ করেন। কারণ ছুটির সময় হয়ে আসছে! ধুত্তেরি কড়াকড়ি! কাঁহাতক আর অফিসে থাকতে ভালো লাগে! কত সব ভালো ভালো জায়গায় যাবার থাকে না!

(৩)

ভবি ভুলবার নয়। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। তিন মহিলা মর্নিং ওয়াক করতে করতে গল্প করেন। নানান সংসারের একই সব ধ্বংসাত্মক আলোচনা—শাশুড়ি-ননদ—কিপ্‌টে নন্দাই—বড়জা ইত্যাদি—যেন জগতে ভালো থাকতে নেই। ঐ যে সেজ ননদের সেজ মেয়ে ওই 'একটু একটু' ভালো বলে মনে হচ্ছে! তবে কিনা—ঐ 'তবে কিনা'ই সাংঘাতিক! কারোকে কি সহজে সার্টিফিকেট দেওয়া যায়! কত রকম গল্প থাকে। নেমন্তন্ন-বাড়ি থেকে খেয়ে এলে লোকে জিজ্ঞেস করত—

—কেমন খাওয়াল?

—ভালো, তবে—

—তবে—তবে কি?

—না, মানে—ঐ নুনটা ঠিক ধুয়ে দেয়নি!

ঠিকই তো। নুনটা তো ধুয়ে দেওয়া উচিত! নজরুল অনেক বুঝেছিলেন বলেই না লিখেছিলেন—দে গরুর গা ধুইয়ে।

মর্নিং ওয়াকের পুণ্য বা 'সুফল' বোধহয় চা বিড়ি-সিগারেট আর পরনিন্দা পরচর্চায় শেষ হয়! তারপর তো আছেই বাজারের থলে!

চায়ের দোকানের আলোচনায় মনে হয় ভালো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই কোথাও! সবাই নাকি দুর্নীতিগ্রস্ত! কিন্তু যারা আলোচনা করছে, অবশ্যই তাদের বাদ দিয়েই! তারা বাদে আর সারা দেশ রসাতলে যাচ্ছে! তারা অফিসে যারা ঘুষ খায় তাদের উদ্দেশ্যে কত কথা বলে থাকে! কিন্তু তুমি বাপু সাড়ে বারোটায় এসে 'সাড়ে একটা'য় কাটো—তার বেলায়? সেটা কোন নীতির মধ্যে পড়ে বাপু?

এ যে আমরা অটলে আছি—বুদ্ধে আছি—মমতায় আছি—! ভাষণ বড় জ্বালাময়ী! নেতা-নেত্রীরা দেশের জন্য যারপরনাই চিন্তিত! চারদিক বক্তৃতা দেওয়ায় জগৎ কাঁপে! কিন্তু অফিসে সারামাস কাজ না করেও মাইনে নেওয়ার সময় এমনকি নিজেদের কাছে রেভিনিউ স্ট্যাম্পও থাকে না! খোঁজ খোঁজ পড়ে যায়! অনেকেই অবশ্য নেতা নেত্রীদের সাহায্য করতে উৎসুক হয়ে এগিয়ে আসে। কেউ ফক্কড়গিরি করে—আছে, তবে একটু ঘষে-মেজে নিতে হবে! ঘরের [illegible] মানে খুব খারাপ জায়গায় পড়ে ছিল—তুলে নিয়ে এসেছি গরিব দুঃখীদের কাজে লাগবে বলে! তা উড়ো স্ট্যাম্প নেতায় নমঃ।

(৪)

সম্প্রতি খবরের কাগজে দক্ষিণ সুন্দরী নাগমার এক ছবি বেরিয়েছে। সে নাকি ইদানীং কিসব আর্ট অব লিভিং করে বেড়াচ্ছে! ভারতীয় ক্রিকেট কাপ্তান অবশ্য এখন অন্যরকম লিভিং-এ বিশ্বাসী হয়ে গেছেন। দিল কা-নাগমা ছেড়ে ডোনা নাকি টোনা মেরে তাকে সানা-র বাপে পরিবর্তন করেছেন। এসব ভারী ভালো খবর! কিন্তু অন্য খবরগুলোর মতো ভালো খবর নয়। সাধারণ খবর! কিছুদিন আগে নাইজিরিয়ার জেলে জেলসুন্দরী নির্বাচিত হয়েছিল। তা নিশ্চয় হাসির ব্যাপার নয়! আর একটা খবর আছে।, তা হাস্যকর না হাসির, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সম্প্রতি ২৭ বছর বয়সী থাইল্যাণ্ডের মহিলা অরুনোতাই ম্রিয়ারান বিশ্বের 'মিস্ ড্রাঙ্ক' -এর সম্মানে ভূষিত হয়েছে! মদ্যপ—তাও আবার কুমারী। তিনি নাকি মদ্যপানের প্রতিযোগিতায় তিন ডজন তাই কুমারীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন। আট পেগ মদ্য পানের পর মদের বোতলে সাজানো আঁকাবাকা পথ স্বচ্ছন্দে হেঁটে গিয়ে তিনি নাকি বলেছেন—আমার একটুও নেশা হয়নি! আমাদের পচার মা চোলাই খেতে এর চেয়েও ওস্তাদ! সে নেহাৎ কম দামি খায় বলে! তার স্বামী যখন তাকে মদ্যপ অবস্থায় পেটে, তখন তাকে বাঁচাতে গেলে সে চ্যাচায়—আমার সোয়ামি যদি আমাকে মারে, তাতে কার কি বলার আছে!

হে সোয়ামি বিবেকানন্দ, ভুলিও না ভারতবর্ষ সীতা, সতী, সাবিত্রী, জয়ললিতা, মায়াবতী, মমতা ব্যানার্জি, পচার মা'—এদের সবায়ের দেশ!

জানে কেয়া হোগা রামা রে! সব খালাস! খাল্লাস!

কলকাতা বইমেলায় পার্ক স্ট্রিট গেটে

এন-১১১ নং স্টলে সবারে করি আহ্বান।

এবারের বইমেলায় প্রকাশিত তিনখানি গ্রন্থ—

কয়লাখনির বহু আজানা কাহিনী নিয়ে লেখা উপন্যাস

দেবদত্ত রায়ের

কালো হীরের দেশে ৭৫্

সফিকুল ইসলাম সম্পাদিত

বৈচিত্র্যের আলোকে নজরুল ১৫০্

ভূমিকা—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সঙ্কলনটিতে লিখেছেন : **বাঁধন সেনগুপ্ত, আব্দুর রউফ, বিদিত কুমার দাস, মজহারুল ইসলাম, জিয়াদ আলি, মীরাতুন নাহার, সুমিতা চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে।**

কিশোর কিশোরীদের উপযোগী

জিয়াদ আলি রচিত

খুশীর চাঁদ ৩০্

প্রতিটি মহান একুশে গ্রন্থ সংগ্রহকারীর জন্য একটি উপহার

দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত সোমেন চন্দের সমগ্র রচনাবলী

সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ ২০০্

এছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ

মহান একুশে ফেব্রুয়ারী পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ সঙ্কলন

মহান একুশে ২০০্

সম্পাদনা মজহারুল ইসলাম, চিত্ত মণ্ডল

জিয়াদ আলি রচিত

নজরুল প্রতিভার উৎস বিতর্কিত বিস্তার ২০০্

মাও-সে-তুঙ রচনাবলী ৪ খণ্ড

৬৭৫ টাকার বই মাত্র ৫০০ টাকায়

প্রতিটি বামপন্থী নেতৃত্বের ও কর্মীর অবশ্য পাঠ্য

কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ

কমরেড্স লাইনটা সোজা করুন ৬০্

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট

কলকাতা-৭০০০০৭

চিরকালের কৌতুক

সংগ্রহ : কাকলি সরকার

দুই মাতাল জামা খুলে পাশে রেখে একটি বাড়ির দেওয়াল প্রাণপণে সরাবার চেষ্টা করছিল। এক চোর সেই জামাকাপড়গুলো নিয়ে চলে যাওয়ার পর মাতালদুটোর হুঁশ হল, তাদের জামাকাপড় উধাও হয়ে গেছে। প্রথম মাতালের উক্তি—দেখেছিস, আমাদের গায়ের জোর এত বেশি যে এই বড় বাড়িটাকে ঠেলে কতদূর নিয়ে এলাম। দ্বিতীয় মাতাল বলল—উঃ, আমাদের জামাকাপড়ও দেখা যাচ্ছে না; কতদূর ঠেলে এনেছি!

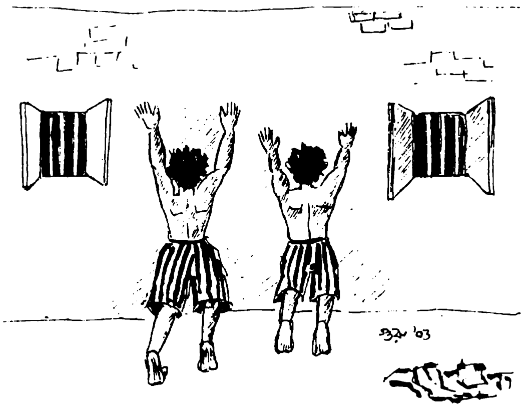

এক মাতাল একটি লাইটপোস্টের কাছে এসে ঘরের তালা ভেবে চাবি ঘোরাতে লাগল। হঠাৎ এক চৌকিদার এসে হাজির।

চৌকিদার : অ্যাই! তুম ক্যা কর্‌তে হো?

মাতাল : বাড়ির দরজা খুলছি, দেখতে পাচ্ছ না?

চৌকিদার : এটা তুমার বাড়ির দরজা? কী করে সমঝলে?

মাতাল : দেখছ না, ওপরে আমার বউ বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

এক ব্যক্তি রেললাইনের ওপর বসে রুটি খাচ্ছিল।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল,—এখানে বসে কি করছেন?

—ট্রেনের অপেক্ষা করছি।

—কেন?

—আমি এখানে আত্মহত্যা করব।

—আপনি তো খাচ্ছেন এখন।

—ট্রেন আসতে দেরি আছে। তাই খেয়ে নিচ্ছি।

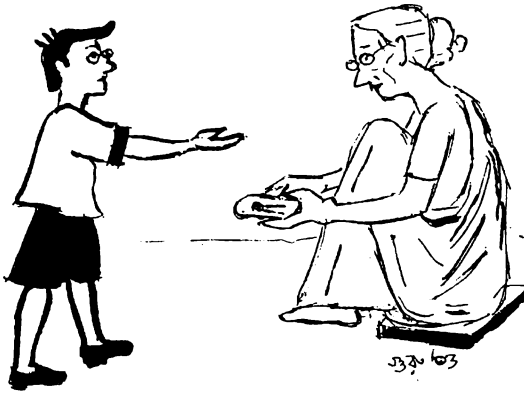

বাবাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে একটি শিশু ভারী বিরক্ত করছিল। হঠাৎ শিশুটি প্রশ্ন করে—বাবা, ডিম কারা দেয়?

বাবা : (বিরক্ত স্বরে) যারা গিলে খায়, তারা।

শিশুটি ছুটে যায় ভেতর-ঘরে। সেখানে ঠাকুমা বসে সুপারি কাটছিল।

শিশু : ঠাকুমা, আমাকে ডিম দাও।

ঠাকুমা : কী দেব? ডিম কোথা থেকে দেব?

শিশু : বাবা যে বলল, যারা গিলে খায় তারা নাকি ডিম দেয়? তুমিও তো গিলে খাও, দাঁত নেই বলে। তবে কেন তুমি ডিম দিতে পারবে না?

হেঁসেল

ইবার বইম্যালায় আপনাদের আর কী খাওয়াই? একটুক ডিংলা-পটাশ, একটুকু ডিম-ছোলার ডাল খায়্যা গায়ে জোর হোক। তখন বইম্যালার ব্যাপারীদের কাছে মনের সুখে ধোঁকাই খান।

ডিংলার সম্বর

কি কি লাগব্যা : অড়হর ডাল আধ কাপ, মোটা করে কাটা পিঁয়াজ আধ কাপ, ডিংলা (কুমড়ো) ছুটু ছুটু করে কাটা ২৫০ গেরাম, ফাড়া কাঁচা লঙ্কা ৩টে, কারি পাতা একটা ডাল, নুন পরিমাণ মতন, তেঁতুল জল পরিমাণ মতন লাগব্যা, সম্বর পাউডার একটুখানি, তিল ত্যাল মাঝারি পোলার ১ পোলা, সর্ষে একটুকু।

যে ভাবে কইরব্যা : তিন কাপ জলে ডালগুলা ভাল করে সেদ্ধ করতে হব্যা। পিঁয়াজের খাদি ও ডিংলার কুচি মিলান, তরকারি সেদ্ধ হলে তেঁতুল জল ও সম্বর পাউডার মিলান। একটু ত্যালে হিং ভেজে লিয়ে গুঁড়া কর্যা সম্বরে মিলালে গন্ধ ভাল হয়। সব কিছু মিলিয়ে ঢাকা দিইয়্যা রাখতে হব্যা। গরম গরম খাব্যা। পরিবারের সক্কলে মিলে দাওয়ায় বসে পড়ুন।

ডিম দিয়্যা ছোলার ডাল

কি কি লাগব্যা : ২টো ডিম, ২ কাপ ছোলার ডাল, নুন স্বাদ মতন, চিনি ছুটু চামচের ২ চামচ, হলুদ ২ চামচ, গরম মশলা, পিঁয়াজ ১টি বাটা, ২কাঁই রুসুন বাটা, ১ চামচ আদা বাটা।

যে ভাবে কইরব্যা : ডিম দুটো অল্প নুন দিইয়্যা ভাল কইর্যা ফেটে লিন, তারপর উনুনের মধ্যে একটা জায়গার মধ্যে জল বসান, তার ওপর একটি ছুটু থালায় ডিম দিয়ে বসিয়ে দিন, যখন জমে যাবে লাবিয়ে লিন, ছুরি দিয়্যা ছুটু ছুটু করে কেটে পাত্রে রাখুন। ছোলার ডাল অল্প নুন দিয়্যা সিদ্ধ করুন, পরে ত্যাল, তেজপাতা ও শুকনো লঙ্কা ও জিরা ফোড়ন দিয়্যা একটু ভেজে পিঁয়াজ বাটা দিয়্যা দিন, ৫ মিনিট পরে লঙ্কা গুঁড়া, হলুদ ও গরম মশলা দিন। ২ থেকে ৩ মিনিট ভেজে ডাল দিয়্যা দিন, ফুটলে ডিমের খাদিগুলা ডালের মধ্যে ছাইড়্যা ভাল কইর্যা লেড়েচেড়ে দিন।

ধোঁকার ডালনা

কি কি লাগব্যা : ছোলার ডাল, ত্যাল, ফোড়ন, হিং, জিরে গুঁড়া, লঙ্কা গুঁড়া, আদা বাটা এবং আন্দাজ মতন চিনি ও নুন লাগব্যা।

যে ভাবে কইরব্যা : আগের রাত্রে ছোলার ডাল ভিজিয়া রাখতে হব্যা। পরের দিন ছোলার ডালটা ভাল করে শিলে বেটে লিতে হব্যা। তারপর কড়াইর মধ্যে একটুকু ত্যাল দিতে হব্যা। ডালের মধ্যে আদা বাটা, নুন এবং চিনি দিতে হব্যা। অল্প আঁচে বাটা লাড়তে ল্যাড়তে ডালটা আস্তে আস্তে মণ্ড মতো হয়ে যাবে তখন ওর মধ্যে ভাজা মশলার গুঁড়া (জিরে, শুকনো লঙ্কা) মিশিয়ে থালার মধ্যে ঢালতে হব্যা এবং হাত দিয়্যা চেপে চেপে দিতে হব্যা। আর একটা থালা দিয়্যা চাপা দিয়্যা একটুকু রেখে দিতে হব্যা। একটুকু পরে ছুরি দিয়্যা খাদি খাদি কইর্যা কেটে ডোবা ত্যালে ভেজে লিতে হব্যা। এই ভাবে ধোঁকাটা তৈরি হল।

সুক্তো

কি কি লাগব্যা : আলু, বেগুন, মূলো, কাল্লা, কাঁচকলা, ফোড়ন, ত্যাল, সর্ষে, ধুনে বাটা, আদা বাটা, পোস্ত এবং পরিমাণ মত হলুদ, নুন।

যে ভাবে কইরব্যা : প্রথমে আলাদা ভাবে ভেজে রাখব্যা আলু, বেগুন, মূলো, কাল্লা আর কাঁচকলা। বড়ি ভেজে রাখতে হব্যা। ত্যাল সর্ষে আর তেজপাতা ফোড়ন দিয়্যা তারপর ভাজা তরকারিগুলা দিতে হব্যা। অনেকটা পরিমাণে ধুনে বাটা, আদা বাটা অল্প হলুদ জলে গুলে ঢেলে দিতে হব্যা এবং একটু জল দিয়ে ঢিমে আঁচে সব কিছু ফুটে সেদ্ধ হয়ে গেলে সর্ষে, পোস্ত আর বাঁটুনি ঢেলে দিয়্যা (সর্ষে আর পোস্ত সমান পরিমাণ, বাঁটুনি অল্প) এবার একটু লেড়েচেড়ে আধ কাপ দুধ আর একটুকু চিনি দিয়্যা লামান। সুক্তো ঠাণ্ডা হবার পরে পাঁচফোড়ন ভাজার গুঁড়ো ছড়িয়া দিন। তারপর দেখুন খ্যেতে কেমন লাগ্যে। আপনি সাধ বুঝতে গিয়ে সবটায় খেয়ে ফ্যালব্যান না যেন।

—মিঠু কারক

আমার বউ তো হিন্দি ছবির পোকা। বাড়িতে দুটো ভি. সি. আর আর তিনটি কেব্‌ল্ কানেকশন। ঠ্যালাটা বুঝুন তাহলে। নিজের বউ মানুষ হল না তো পাবলিক কোন ছার! তাহলে আপনারা অতঃপর পরিকাঠামো গড়ার দিকে নজর দিন।

কড়চা ২০০৩

অমিতাভ সান্যাল

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ২০০৩

হায়াৎ রিজেন্সির 'বলরুমে' এক মহতী সভা আয়োজিত হয়েছে। থ্যাটার, ফিল্ম ও সঙ্গীতের উল্ললাট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত। মনে হচ্ছে কিছু একটা হবেই আজ। সহ্যের সীমা আছে একটা। এবার করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। বোম্বাইয়া বোম্বেটেদের এই 'স্ক্যাম' আর সহ্য করা যায় না। 'থ্যাটার ও ফিল্মমন্ত্রী' এসে গেলেও 'গানমন্ত্রী' এসে পৌছাননি এখনো। মেহেদী হুসেন সানাই বাজাচ্ছেন। দু'পাশে একান্ন করে একশো দুইটি খুকি পাপড়ি বৃষ্টি করে চলেছে। ইদানীং ঘোর অর্থসঙ্কট চলছে। তাই 'বোকের' বদলে পাপড়ি। এতে পাঁচ শতাংশ খরচ কমেছে।

জনরব উঠল—এসে গিয়েছেন, এসে গিয়েছেন। 'কে এলেন ভাই?' আজকের এই মহতী সভার যিনি মেগা-সভাপতি, সেই গানমন্ত্রী এইমাত্র গাড়ি থেকে নামলেন। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। মাথায় হিমাচলী টুপি, মুগার ধুতি ও পাঞ্জাবি, নস্যি শাল আর পায়ে নাগরা। এমন মুগা-সুন্দর মন্ত্রী আর নেই। তাই তাঁর বিকল্পও নেই।

সুন্দরীরা ছুট লাগালেন। মন্ত্রী মহাত্মাজির ভঙ্গিতে দুটি সুন্দরীর কাঁধে ভর দিয়ে চলতে থাকলেন। মন্ত্রীকে দেখে সবাই 'স্টাঞ্জি ওভেশন' জানালেন। মন্ত্রী বসলেন। সভা শুরু হল।

'সেনটো' হল এই দেশের কেন্দ্রীয় কর্মী সংগঠন। সেই সংগঠনের থ্যাটার ফিল্ম শাখা 'সেনফোর' প্রধান কুমার সত্যজিৎ বললেন, বন্ধুগণ, রাজ্যের সংস্কৃতি ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। রাজ্যের মানুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা আয় করে আর বিনোদনের নামে সেসব হাম করছে বোম্বেটেরা। এসব আমরা

চলতে দেব না। মাতৃভাষা হল গে বিনোদনের মাতৃদুগ্ধ। মাতৃভাষায় সঙ্গীত, নাটক, ছবি। কবি বলেছিলেন না, আমরি মাতৃভাষা!

প্রথম সারিতে বসা মানুষেরা জোর হাততালি দিলেন। ঠিকই তো, কবি এরকম কথা বলেছিলেন বটে! তবে কোন কবি কবে এসব কথা বলেছিলেন, সেকথা কারোর মনে পড়ল না। আবার বক্তৃতা শুরু হল,—অথচ আমাদের ছবি চলে না, মানুষ থ্যাটার দেখে না, তারা গান যায় না। পাবলিক গাল পাড়ে। 'বাবা কেন জল কাটে' 'পুকুরে জাল, খালে ছিপ... হুররে হিপ্ হিপ্' 'মা, মশারি টাঙা', 'টাঙ্গা চেপে আসছে দুলহা ভাই' ইত্যাদি নাকি ছবিই নয়। স্বীকার করছি, এখানে নায়িকাদের মোটা কোমর ও থলথলে বডি। নায়কেরা বেঁটে ও মোটা—তবে তাতে কি? আমরা কি আর প্রতিবেশিদের মতো বডি দেখাবার ঠেকা নিয়েছি? ভাগ্যিস গ্রামবাংলা ছিল, তাই বেঁচে রয়েছি।

সেনফোর উপপ্রধান কুমারপ্রসাদ চক্কোতির

গাল ভরা দাড়ি। তিনি কথা বললেন নাকি বিলাপ করতে লাগলেন বোঝা গেল না। তিনি এভাবে শুরু করলেন,—নাঃ আত্মসম্মান নিয়ে এদেশে আর বসবাস করা যাবে না গো! পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো আমি কি করব? আমি ডিসইনজেট পোর্টফোলিও ডিল করি নাকি? টিভিতে প্রোগ্রাম করলে দু'চার পয়সা আসে। সেখানেও বিপত্তি। ছড়া কেটে শোনায় আমায়,—

এই মাটিতে থিয়েটার,
নস্ট করল সব কদাকার,
এই স্যাঙাৎ টিভিতে ধায়,
মনের সুখে পয়সা কামায়!

বলুন বন্ধুগণ, পয়সা কামানো দোষের? এটা অন্যায়? গ্রুপ থিয়েটার ভেঙে খান্‌খান্ হয়েছে তো কী করা যাবে? না ভাঙে যদি গড়ে কি প্রকারে? মহামতি মার্কস বলেছিলেন না, থিসিস, অ্যান্টিথিসিস, সিনথেসিস! কমরেড মার্কস লাল সেলাম। একদা ছিল মাত্তর দশটি থিয়েটার। সেসব ভেঙে এখন দুশো দশে দাঁড়িয়েছে। যদিও কেউই তেমন কল্কে পাচ্ছে না। আরে মশাই, লোকে যদি থ্যাটার দেখতে না চায়, কী করব বলুন? এ কি জলভরা তালশাঁস যে পেলেই খাও? আপন-পর ভেদ করো না! টিভিতে গিয়েছি কি সাধে! শুধু আমি কেন, আমার মতো অনেকেই গিয়েছেন। আর যাবেনও। থিয়েটারের হ্যাপা অনেক। আড়াই ঘণ্টা স্টেজ জুড়ে উল্লুকের মতো দাপাদাপি। তার চাইতে চেয়ারে বসে সোজা-সাপ্টা কথা বলা অনেক ভালো। আরো বলি, জনগণ—সর্ষের মধ্যে বিস্তর ভূত। আমাদের মহা সংস্কৃতি মন্ত্রী (থ্যাটার) সিংহাসনে বসার আগে যিনি ছিলেন রাজসভায়, তাঁর কিম্ভূত কিমাকার ফতোয়াতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। কেন, বলি। নাটকে যদি ভালোবাসার ব্রো হট, কথার সুড়সুড়ি, দুষ্টু মিষ্টি সেক্স আর জড়াজড়ি না থাকল, তবে দর্শক আসবে কেন? তা সেই মন্ত্রী সংস্কৃতির নামে স্যাটাস্যাট এক এক করে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির ওপর তুরপুণ চালালেন যেই, সবগুলো মুখ থুবড়ে পড়ল।

নাটক, দাদা, আমাদের রক্তে। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। শুকিয়ে যায়নি। একটু তা বা তাপ পেলেই দেখবেন টগবগিয়ে ঘোড়ার খুরে খুরে। এ তো আমার একার কম্ম নয় রে ভাই। সবাইকে এসে হাল ধরতে হবে। কালেকটিভ রেসপনসিবিলিটি যারে কয়!

সবশেষে উঠলেন, মানে মঞ্চে উঠলেন সেনডিমো প্রধান রূপালি সাহা। রূপালি অবিবাহিতা। সর্বাঙ্গে প্রভূত সাজ। বিনোদন জগতের অবিবাহিতা মহিলারা জবরদস্ত সাজপোশাক করতে ভালোবাসেন। বললেন তিনি, বন্ধুগণ, রেকর্ডের দিন শেষ হয়ে ক্যাসেটের দিন এল যখন, ভাবলাম এবার সুদিন আসবে বোধহয়। ওমা, কোথায় সুদিন। প্রথম সারির এক-দেড়শো ক্যাসেট কোম্পানি মুম্বাইয়া শিল্পীদের ক্যাসেট করছে পরমানন্দে। বিশ্বসংস্কৃতির পীঠস্থান এই শহরের বুকে এইরকম বাটপাড়ি সহ্য হয়? তারপর ফিল্মের গান? ফাংশনের গান? সেখানেও সেই বোম্বেটের দৌরাত্ম্য। আমাদের গলা নাকি সুরে লাগে না। আমাদের গলায় নাকি সাত সুর তেমন খেলে না। আমাদের নাকি রেওয়াজি গলা নয়। অথচ আমাদের এখানে ট্যালেন্ট-এর অভাব? সাত-আটশো ছেলে-মেয়ে নানারকম কণ্ঠ বা কণ্ঠী হয়ে লড়ে যাচ্ছে। কী সুন্দর গাইছে তারা। কিশোর, মুকেশ আর ডেড, লতা আশা আর এজেড, লঙ লিভ কিশোর, লতা এ্যাণ্ড আশা। অথচ এই সব প্রতিভাবান সন অব দ্য সয়েলরা কল্কে পায় না। আমরা কল্কে পাই না। এটা বাঙলার অসম্মান নয়?

আমরা শরৎকালের জন্য মুখিয়ে থাকি। ভারতবর্ষ জুড়ে দুগগো পুজো আর পুজোর আসরে গান। অন্যান্য অঞ্চলগুলি আমাদের মতো এতটা গরিব হয়ে পড়েনি তো, তাই দু-চার পয়সা আসে। মুম্বইতে যেসব বঙ্গসন্তান একদা দাপিয়ে বেড়াতেন বা ফাটাফাটি করতেন তথা ফাটিয়ে দিতেন, তাঁরা অবসর জীবন যাপন করতে এখানেই আসেন আর 'ডাউন সেন্টিমেন্টাল মেমোরি লেন'-এ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন এখানেই। আমরা তাদের হিংসা করছি না। হিংসে করব কেন, বলুন? তবু বলছি, গান বেচে বা গলা বেচে তো আমাদের ভরণ পোষণ। সন বা ডটাররা যদি সয়েলে প্রোডাক্ট সেল করতে না পারল তবে বেঁচে থেকে লাভ কি?

এইভাবে সেনকো বা সেন্টার অব কালচারাল অর্গানাইজেশনের দুই প্রশাখা, সেন্টার অব থিয়েটার এণ্ড ফিল্ম অর্গানাইজেশন বা সেন্টফো সেনডিমেশন এবং সেন্টার অব ভোক্যাল এণ্ড ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক অর্গানাইজেশন বা সেনভিমার কর্তারা নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করলেন। এবার গানমন্ত্রীর ভাষণ শুরু হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে উপবিষ্টা মহিলারা চট করে ঠোঁটে সিদুঁর গালে রুজ পাউডার মেখে নিলেন। পুরুষেরা হাতে হাতে চুল মেরামত করলেন বা পরচুলার ফিটিং ফিক্সিং ঠিক আছে কিনা দেখে নিলেন। গামন্ত্রী ইতিমধ্যেই পজিশন নিয়েছেন। অতঃপর তাঁর বক্তৃতা শুরু হল—

: আমি শুরুতেই একটা কথা বলি। রূপালি আমাদিগকে বড়ই অসম্মান করেছেন। গরিবি হটানো যাদের বীজমন্ত্র তারা গরিব হয় কী প্রকারে? ওসব বিরোধীদের অপপ্রচার। আমরা এখন কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করছি কিনা, তাই কৃচ্ছ্র সাধন।

এবার মূল কথায় আসি। বাংলা ফিল্ম তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। পাঁঠা যেমন স্বেচ্ছায় হাড়িকাঠে গলা ঢোকায় না, মানুষেরা তেমনি বাংলা বই দেখে না। এদিকে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে আমদানি-শুল্ক বসানো যাচ্ছে না কোনোমতেই। তা আমি বলি কি, মা-লক্ষ্মীগণ, যদি একটু কম খান বা জিমে যান, অচিরেই তাঁরা বরণীয়া হবেন। আমাদের জল ও তেলের অনেক গুণ। চীনেরা খুব সাইকেল-খোর; তারা লম্বাও তাই। তা বাংলার দামাল নায়কেরা সাইকেল চালিয়ে বা প্যারালাল বারে শরীর দুলিয়ে লম্বা হতে পারেন। আমার বউ তো হিন্দি ছবির পোকা। বাড়িতে দুটো ভি. সি. আর আর তিনটি কেব্‌ল্ কানেকশন। ঠ্যালাটা বুঝুন তাহলে। নিজের বউ মানুষ হল না তো পাবলিক কোন ছার! তাহলে আপনারা অতঃপর পরিকাঠামো গড়ার দিকে নজর দিন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে বছরে অন্তত চারটি ছবি প্রযোজনার ব্যবস্থা করেছি। আপনারা শুনেছেন তো, আমরা নিউ টাউনে একটি অত্যাধুনিক স্টুডিও করছি। আদিতে ওখানে কার রেসিং কমপ্লেক্স গড়ে তোলার কথা ছিল। কমিশন নিয়ে বনিবনা না হওয়াতে কার ছেড়ে ফিল্ম ধরেছি। আমাদের তো অনেক কিছু করার স্বপ্ন। মানুষজনের কত দুঃখু। দুঃখের কথা ভাবতে গিয়ে যৈবন গেল।

থ্যাটার জগতের মানুষদের উসখুশ করতে দেখে মন্ত্রী বললেন, দেখুন ভাইয়েরা, সারা বাংলায় আমরা পাঁচশো মঞ্চ গড়েছি। ওখানে গিয়ে থিয়েটার করেন না কেন? মজার থিয়েটার করে পাবলিকের মন জয় করুন। আমাদের রাজনীতি প্রচার করে পয়সা করুন। কার্জন পার্ক, ভিক্টোরিয়ার মাঠে নাটক করে ফাটিয়ে দিন। আরে মশাই, নবতম কিছু ভাবতে হবে তো!

সবশেষে রূপালিকে বিষণ্ণ দেখে মন্ত্রী বললেন, আপনাদের নিয়ে পরে একদিন বসব'খন। আপনারা আপাতত মাংস, মাছ, চাল, ডাল, কাপড়-চোপড়ের সাথে ক্যাসেট পুশ করুন। পাঁচ কিলো মাংস কিনলে দুটি, এক কুইন্টাল চাল কিনলে পাঁচটি ক্যাসেট ফ্রি। এই ব্যবস্থাটা পাবলিক ইদানীং খাচ্ছে খুব। শুধু ক্যাসেট বানালে হবে নাকি—গর্ভসঞ্চার করতে হবে না? কী বলেন, রূপালি?

শীতকাল

আইভান হো হো

শীতকালে বাঙালি জীবনে তিনটে জিনিস হয়। ম্যাটাডোরে পিক্‌নিক্, ময়দানে মেলা আর মাঝখানে চুলকানি। এরমধ্যে যারা খুব কপাল করে আসে তারাই চুলকানির সুখ পেয়ে থাকে। ঠাকুরের সেই নির্বিকল্প সমাধির কথা মনে আছে? ধ্যান, জ্ঞান, বাহ্যদশা লোপ পেয়ে ভাবসাগরে অবাধ বিচরণ। কে এল, কে গেল খেয়াল থাকে না। কেবল হাতঘড়ি চলছে। পায়ের খাঁজে সুখের জাহাজ ভিড়ছে। বাইরে কে যেন নাম ধরে ডাকছে। সে ডেকে ডেকে ফোক্‌লা হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে শীতকাল কেটে গিয়ে আবার শরৎ ফিরে আসবে। কাশফুলের জঙ্গলে ভরে যাবে শরীরের অন্ধকার জায়গাগুলো। হাতঘড়ি চলবে আগের মতোই। একটু ফাস্ট হতে পারে। কারণ এদিকে পেণ্ডুলামও দুলছে। সুখ এখন কলেরার মতো ছড়াচ্ছে। পায়ের কড়া, কানের চুল, পিঠের তিল—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। চোখের পাতায় রাষ্ট্রীয় শোক। অর্ধনিমীলিত। এর মধ্যে গোটা পাঁচেক টেলিফোন এসে ফিরে গেল। কেউ একজন বার বার ট্রাই করছে। করবেই। বুদ্ধ যখন ধ্যানে বসেছিল তখনও এসেছিল সাপ, সিংহ, সুন্দরী, সুড়সুড়ি। কিন্তু বুদ্ধের সাধনা সবাইকে ফিরিয়ে দিয়ে কালজয়ী হয়েছিল। আজও সাধুরা অহংকারকে হারাতে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলে। আর বলে কম্যুনিস্টরা। তবে ধন বৈভব বাড়াতে। বুদ্ধ একাধারে বাম, নাট্যরসিক, আবার বাস্তববাদী। নে, এখন কি করবি কর। ওদিকে মমতা মারকাটারি। বিগ্রেড ভরিয়ে ভরিয়ে পাশবালিশ হয়ে গেল দলটা। অটল ক'দিন জড়িয়ে শুয়েছিল। শেষে হাঁটুর রোগ ধরে গেল বেচারার।

যে ম্যাটাডোরে পিক্‌নিক্ করেনি সে মাধ্যমিক পাশ দেয়নি। মাধ্যমিকের বয়স পেরিয়েই আসে ম্যাটাডোরের বয়স। শহর থেকে দূরে যাবার জন্যেই ম্যাটাডোর। বাপ-মার থেকে দূরে যাবার জন্যেই ম্যাটাডোর। বিবেক-বুদ্ধি থেকে দূরে যাবার জন্যেই ম্যাটাডোর। আবার শ্যাওলা ধরা সংসার ফেলে ঠাকুরের মুক্তিমেলায় যাবার জন্যে ঐ ম্যাটাডোর। বক্সে তখন অন্য গান বাজে। খাট ধরে ছেলেরা চরিত্র সামলে বসে আছে। ঝুরো হতে চুল্লিতে নেয় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ওর মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসতে হবে সবার অলক্ষ্যে। ঝেড়ে ফেলতে হবে বাবার আলমারি। ভাঁড়ারঘরে আলো নিবিয়ে ভ্যাকুম্ ক্লিনার নিয়ে অপেক্ষা করবে ছোট বৌ। পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে যা কামাইনি, পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তা কামিয়ে নিতে হবে। হয় এবার, নয় নেভার! ফেরার পথে পাড়ার মুদি হেঁকে দিল, 'ছোটবাবু, তুমি যাওনি?' 'চুপ্ শালা, তুই ভাত বসিয়ে বাজার যাস না!' কর্তাবাবুর আত্মা ঐকথা শুনে মেঘে হোঁচট খেল।

বলি হরি, হরি বোল
ওরে ভাই চোখ খোল।
ছোটজন নেমে গেল
ফাঁকা মাঠে মারবে গোল,
বড় বলে, দেখা যাবে
কার পেশী কত গোল।

একটু ঝোলাগুড়ের জন্যে সারা বছর ঝুলে থেকে এই শীতে মুখ ফসকে যাবে—একদিন পিঠে করো না গো। ব্যস, বউয়ের পিঠে উঠে বসল নূরজাহান—লেক রোডের হাজার স্কোয়ার ফুট মোজায়েক ফ্লোরের মালিক হয়ে তুমি পিঠে খাবে! পিঠেপুলি কুলিরা খায়! তোমায় বরং আমি উটের মাংসের বরফি খাওয়াব। ইন্দিরা করে করে সঞ্জয়কে খাওয়াত।

—এই পড়ে থাকার বয়সে উটের টেংরি কি আমার সহ্য হবে গো?

—উঠে দৌড়তেই হবে তোমাকে। ছেলে তো আলাস্কায়—গণপ্রজাতন্ত্রী এস্কিমোতে। কে তোমায় টেনে নিয়ে যাবে? শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার আগে নাক চেপে ছুটবে শ্মশানে। ঘরে পড়ে থাকলে 'পল্যুশান'-এ পড়ে যাব। জলকরের ওপর আবার জঞ্জালকর জুড়বে!

—কেন, ছেলে তো স্লেজগাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। ডেডবডি স্লেজে চাপিয়ে বুকের ওপর একশো ব্রিটানিয়া ছড়িয়ে চু চু করে সবকটাকে ডেকে নেবে। জানো তো, স্লেজগাড়ি কুকুরে টানে! আর বড় ঠোঙায় এক কেজি লেড়ো নিয়ে ছড়াতে ছড়াতে শ্মশান পর্যন্ত একজনকে যেতে হবে। শীতের সময় রাস্তায় জোড়াকুকুর পাবে। কষ্ট করে শুধু স্লেজের সঙ্গে জুড়ে দেবে। এদিকেরটা টানলে নিমতলা, ওদিকেরটা টানলে ক্যাওড়াতলা।

বই-ঠগী গল্প

পিনাকী ভাদুড়ী

বইমেলায় যদি সময় করে গিয়ে এবং সময় করে নিয়ে একটু বই নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাহলে আপনি বাংলা সাহিত্যের এখনকার মোদ্দা কথাটা বুঝতে পারবেন। বুঝবেন কেন সাহিত্য এখন বোঝাই যায় না, বরং বোঝা মনে হয়। অবশ্য সাহিত্যের তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ কেউই তো অপরিহার্য নয়। কেউ না থাকলেও চলে। কেউ চলে গেলেও চলতে বাধা হয় না।

বইমেলায় বই আছে প্রচুর। প্রকাশক আছে তো বটেই, দপ্তরী আছে, ইলাসট্রেটর, কার্টুনিস্টও আছে, এমনকি খুঁজলে এক-আধটা ক্রেতাও মিলবে। কেবল দুটি প্রাণীর অভাব। সে দুটি হল সাহিত্যিক ও পাঠক। তাও অসুবিধে হচ্ছে না। ও দু'জনের কাজ করছে লেখক এবং ক্রেতা।

আজকের বই যারা লেখে তারা কেউই সাহিত্যিক নয়, লেখক মাত্র। যেমন কেউ হিসেব লেখে, সেভাবে কেউ কেউ বইও লেখে। বাজারের হিসেবে যেমন রোজ আলু পটল, উচ্ছে মুলো কিনতে হয়, বাজারের বইতেও তেমনি প্রেম রেপ আদর্শ জোচ্চুরি এসবের অর্ডার থাকে। এই অর্ডারেই পরপর দেখাতে হয়। মনে রাখতে হয় যে এগুলো সিরিয়াল হবে। সিরিয়াস মুখ করে কথা বলবে সবাই, তাদের সেই সব ভারি ভারি কথা শুনলে হাসি পাবে সকলের। তবু এদের মার নেই, বরং এরাই মার মার করে চলছে।

গম্ভীর প্রবন্ধ বা গভীর উপন্যাস এখন কেউ লেখে না। লিখতে পারে না বলেই লেখে না। সাহিত্য আগে ছিল জীবন, এখন হয়েছে জীবিকা। জীবিকার মতোই এখানে প্রোমোশন পাওয়াটাই লেখকের ইনটেনশন। গল্প ফাঁপিয়ে উপন্যাস, উপন্যাস ফুলিয়ে টি-ভির চ্যানেল, লেখার এখন এই একমাত্র চ্যানেল। যে বই দুম্ করে জমে যায়, আবার দু'মাসেই দমাস্ করে শেষও হয়ে যায়। দু'বার পড়ার মতো বই কেউ লেখে না। একবারই লেখে, পরেরবার প্রাইজ পায়, তার পরেরবার তাকে সবাই ভুলেও যায়। কাগজের কাপে চা খাওয়ার মতো, খাবার সময় কাপটা চেপে ধরে থাকো, খাওয়া হলেই ফেলে দাও। ও কাপে আর খাওয়া যাবে না, যেমন ও বই আর পড়া যাবে না।

একটা পুরনো গল্প এখানে শোনাই। মফঃস্বলের একটি ছেলে এসেছে কলকাতায়। গিয়েছে বইপাড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে বই কেনা-বেচা। দেখতে দেখতে শুনছে কাউন্টারে সেল্সম্যান ক্যাশমেমো কাটতে কাটতে হেঁকে বলছে, 'একখানা গোরা, দু'খানা পথের পাঁচালী, বিশখানা ফাগুন গিয়েছে চলে'। মফঃস্বলের ছেলেটি বুঝল যে ঐ বিশ-বিক্রি বইটাই বেশ বই। দু'বছর বাদে সে আবার এসেছে কলকাতায়। এবারেও দাঁড়িয়েছে বইপাড়ায়। এবারেও সে কান পেতে আছে কাউন্টারে। এবারে সে শুনল, 'দু'খানা গোরা, তিনখানা পথের পাঁচালী, পঁচিশটা প্রেম এসেছে জীবনে। একটু অবাক হল সে। সেই বিশ-বিক্রি বেশ-বেশ বইটা কোথায় গেল? তাহলে কি ঐ প্রেম এসেছে জীবনে বইটাই....? সে বিশ বাঁও জলে পড়ল। তবে একটু ভাবতেই বুঝতে পারল সে যে, হট্ করে যারা বিক্রি হয়, তারা চট্ করে ফুরিয়েও যায়। থাকে ঐ চিরকালের এক-দু'খানা বিক্রি বই। থেকে যায়। সাহিত্যিক আর লেখকের তফাৎটাও সে বুঝতে পারল এখন।

এই তার 'বইকে পাল্লা দিতে হচ্ছে

কম্পিউটারের সঙ্গে। সেখানেই এখন বই পড়ে ফেলা যায়। শুধু তাই নয়, সেখানে অনেক সাজাতে হয়। দেখেই মনে হবে, কী সুন্দর গেট-আপ। ভেতরে অবশ্য ফক্কি সব। Get upয়ের পরেই Sit down.

তাছাড়া বই পড়ার দরকারই বা কিআর ? টিভিতেই তো সব জানা হয়ে যাচ্ছে। রামায়ণ মহাভারত তো ওখানেই দেখলাম। কী সুন্দর ছবি। বাকল পরা মেয়েদের দেখা হয়ে গেল, যারা সে যুগেও এ যুগের হুজুগমতোই সাজত। আর যুদ্ধে, দৃশ্যগুলো? মনে হচ্ছে যেন এখনকার গাল্‌ফ ওয়ারের লাইভ্ কভারেজ দেখছি। বই পড়ে কি এসব পাওয়া যেত? রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে তো এইরকম সিরিয়ালেই Burial দেওয়া হয়েছে। দেবদূতেরা যেখানে যেতে পারেন না, সেখানে Fools rush in—TV তাই এত বিউটিফুল। কে যেন বলেছিল, Marx-য়ের Das Capital পড়েছ? তাকে বললাম—না, টিভিতে দেখে নেব। ওরা নিশ্চয় তুলবে ওটা?

তবু বইমেলা হয় প্রতিবার হয়, প্রতিবারই যেমন শীতকালে সার্কাস হয়, তেমনই। প্রতিবার যাই এবং প্রতিবারেই ভুলে যাই। একটা বেড়াবার জায়গা তো হয়। বান্ধবীকে নিয়ে যদি যাই, তখন কেমন জ্ঞান দেওয়ার ইচ্ছে জাগে। তাতে প্রেম বেড়েও যেতে পারে। দু'জনে মিলে স্টলে স্টলে বেড়াই, কোথাও Stalled হই না—শেষপর্যন্ত দু'জনে রেস্তোঁরায় বসি। বই না কিনে খাবার কিনি। কেনার মতো বই কোথায়? সেই ভদ্রমহিলার গল্পটা মনে করুন, কেমন করুণ যেন। তাঁর স্বামী বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। সব জিনিসই ঘুরেফিরে তাঁর বাড়িতেই ফিরে ফিরে আসে। কিছুরই অভাব নেই। দোকানে গিয়ে তাই ভদ্রমহিলা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেন না। ওঁকে যা-ই দেখানো হয়, উনি বলেন, 'এ তো ওঁর আছে একটা।' যত রকম গ্যাজেট, যত রকম মডেল, যত রকম ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে চমকে দেওয়া জিনিসপত্র, সব দেখিয়েছে দোকানি, কিন্তু সবই তো 'ওঁর আছে একটা'। উপহার দেওয়া যাবে না তাহলে? ক্লান্ত দোকানি শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েও একটা নতুন বই বার করে আনল, 'এই বইটা দিন'। মহিলা আরো হতাশ গলায় বললেন, 'বই? সে-ও তো ওঁর একটা আছে।'

ঠিক কথা। একটা বই তো আমাদের সকলেরই ছিল। বর্ণপরিচয়। অক্ষরের বর্ণনায় পরিচয়ের সহজ পাঠ। তা থেকেই শুরু তাতেই শেষ। সব বইতে ওই কটাই বর্ণ। বর্ণে বর্ণে সত্যি সেই সব বই।

কিন্তু আমি যে বোকার মতো এত বই জড়ো করেছিলাম বাড়িতে তার কী হবে? বইমেলায় বাজার নিয়ে বসব ওই বইগুলোর? নীলামের মতো যা পাওয়া যায়? নাকি বিলিয়ে দেব একে, ওকে, তাকে? তা-ও কেউ নেবে না। কে নেবে বই? লোকে ক্লাসিক কেনার জন্য লাইন দেয়, পড়ে না এক লাইনও। শুধু সাজিয়ে রাখে। ইনটিরিয়র ডেকরেশনে যে বই লাগে তা দেয়ালের মাপে নিয়ে আসতে হয়। শেকসপীয়র সেখানে দরকার না-ও হতে পারে। তবে Sex Appear যাতে আছে, সেগুলো আলমারির কোনায় গুঁজে রাখে সবাই।

তবু লোকে এখানে আসে। তাই প্রকাশকেরাও আসে। মেলায় যেমন পাঁপড়ভাজা খায়, রগরগে তেলেভাজা, এখানেও তেমন বইই বিক্রি হয়, যা পরের মাসে পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে বেচে দেওয়া যাবে।

আসলে সব ভালো জিনিসের মতোই ভালো বইও কম লেখা হয়। একটা বই কিনলে আরেকটা বই ফাউ দিয়েও সামলানো যাচ্ছে না তাই। কারণ ফাউটাও তো বাড়ির জায়গা আটকে রাখছে। টুথপেস্ট ফাউ দিলে লোকে নেবে কারণ সেটা কাজে লাগবে, জায়গা জুড়বে না। বই টুথপেস্ট নয়, ট্রুথপেস্ট। কিন্তু ট্রুথ তো কেউ চায় না, সকলেই ফিক্‌শন চায়। তাহলে বইয়ের কি হবে? মেলাই সাজান আর বাড়িই সাজান বই নিয়ে, তবু বই কি একটা সাজা হয়ে পড়ছে?

ঠিক তা নয়। বইমেলার একটা গুণ তো আছেই। এখানে আসতে আসতে যদি আপনার পড়ার নেশা হয়ে যায়, তাহলে আপনি অন্য নেশায় পড়বেন না। 'মরা মরা' বলতে 'রাম রাম' এসে যাবে। দস্যু রত্নাকর লিখে ফেলবেন রামায়ণ।

বইয়ের নেশার একটা গল্প শুনিয়ে শেষ করি। এক অধ্যাপকের বইয়ের নেশা ছিল। তিনি বই নিয়েই থাকতেন, বউয়ের দিকে তাকাতেন না। বউ নিরাশ হয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করল, 'মা সামনের জন্মে বই করে পাঠাস মা। তাহলে যদি স্বামীর নজরে পড়ি।'

সেই প্রার্থনা মা শুনলেন কিনা জানি না, স্বামী শুনলেন। তিনি সংযোজন জুড়ে বললেন, 'মা যদি বই করেই পাঠাবি তবে পাঁজি, করে পাঠাস। যাতে বছর বছর বদলাতে পারি।'

এরপর কোনো পাঠিকা কি আর যাবেন বইমেলায়? ওইজন্যই কি পাঠিকাদের বই পড়ার সুনাম নেই?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
GITANJALI
(SONG OFFERINGS)
এবং
গীতাঞ্জলি
(SONG OFFERINGS) এর ইংরাজী ১০৩ টি ও বাংলা ১০৩ টি গান ছাড়াও বাংলা গীতাঞ্জলির বাকি ১০৪ টি গান সহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশন।
চিরন্তন গল্পমালা
(কাবুলিওয়ালা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পোস্টমাস্টার, সম্পত্তি-সমর্পণ, গিন্নি, ছুটি ও ইচ্ছাপূরণ - একত্রে একটি বই)
নজরুল ইসলামের
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি
(ছড়া ১ম ও ২য় খণ্ড)
সুজিতনাগ সম্পাদিত
সোনালি দিনের গল্প
পৃথ্বীরাজ সেনের
যারা থাকে সাগরে
বারো ভূত অদ্ভুত
দুলাল চন্দ্র দত্তের
গল্পের ফুলঝুরি
রং মশাল
পীযূষকান্তি রায়ের
মুন্সী প্রেমচাঁদের শ্রেষ্ঠ গল্প
১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড
সপ্তপর্ণী গল্প সংকলন
আলো ঘোষের
রান্না বান্না
মোহন লাইব্রেরী স্টল নং - এস ১৭৯
৩৫এ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯, ফোন : ২৩৫০-০৬৩৩

ঠাট্টা

সনৎকুমার মিত্র

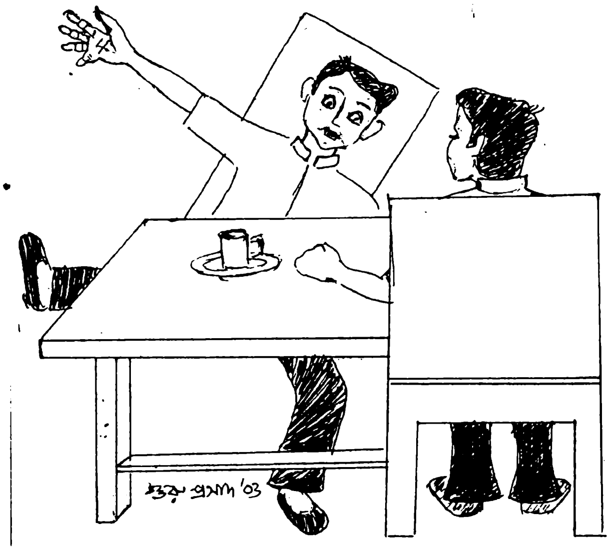

অমল ।। আয় দিব্যেন্দু, বোস। তোর জন্যে সেই সাড়ে পাঁচটা থেকে এই বোস কেবিনে বসে আছি। আজ তোর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত না করে উঠছি না।

দিব্যেন্দু।। কেন? কী করেছি আমি?

অমল ।। তুই আমার সর্বনাশ করেছিস! আবার জিজ্ঞাসা করছিস, কী করেছি?

দিব্যেন্দু।। কী বলছিস অমল? আমি তোর সর্বনাশ করেছি? ধুৎ! তুই আমার সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তোর সর্বনাশ করতে পারি?

অমল ।। করিসনি? তুই গতকাল আমার বৌকে ফোন করিসনি?

দিব্যেন্দু।। হ্যাঁ—তোর বৌকে ফোন করেছি। কিন্তু প্রেম নিবেদন করিনি তো? সম্মান দিয়ে কথা বলেছি। বৌদি বলে কথা বলেছি।

অমল ।। বৌদি বলে কথা বলেছিস! কিন্তু কী কথা বলেছিস?

দিব্যেন্দু।। সত্যি বলছি, কোনো অশ্লীল কথা বলিনি। কোনো খারাপ কথা বলিনি।

অমল ।। খারাপ কথা বলিসনি? তুই বলিসনি—অমল আজকাল খুব বেশি চা খাচ্ছে?

দিব্যেন্দু।। চা? হা-হা-হা! হ্যাঁ তা বলেছি। ঠাট্টা করে বলেছি, অমল আজকাল খুব চা খাচ্ছে। তাতে কী হয়েছে? এটা কি খুব খারাপ কথা?

অমল ।। দ্যাখ দিব্যেন্দু, তুই ন্যাকা সাজিস না। তুই বুঝতে পারছিস না তুই আমার কত বড় সর্বনাশ করেছিস। আমি খুব চা খাচ্ছি। তার ফলে আমার খিদে কমে যাবে, অম্বল হবে, শরীর খারাপ হবে। সুতরাং আমার বৌ আজ আমার পকেটে মাত্র চার টাকা রেখে বাকি টাকা নিয়ে নিয়েছে। বলেছে, যতক্ষণ খুশি গল্প করো, কিন্তু দু'কাপের বেশি চা খাবে না। —এখানে এসে তোর জন্যে বসে থাকতে থাকতে এক কাপ চা খেয়ে ফেলেছি। সুতরাং এবার তুই চায়ের অর্ডার দিবি। দামও তুই দিবি।

দিব্যেন্দু।। ওঃ, এই কথা? ঠিক আছে, আমিই চায়ের দাম দেব। আর কোনো সমস্যা নেই তো তাহলে? ঠাট্টা যখন আমি করেছি, জরিমানা আমিই দেব। সারাদিন তো সংসারের চাকায় ঘুরপাক খাচ্ছি। বিকেলে চায়ের দোকানে এই আড্ডা হচ্ছে আমাদের প্রাণ। ঠিক কি না বল?

অমল ।। তা ঠিক। কিন্তু দিব্যেন্দু, তুই এটা হালকা ভাবে নিচ্ছিস কেন? তুই বুঝতে পারছিস না আমার আর্থিক স্বাধীনতা তুই শেষ করে দিয়েছিস? ইচ্ছে হলে আগে কোনোদিন একটা কাটলেট খেতাম, অথবা একটা মোগলাই পরোটা খেতাম, তোকেও খাওয়াতাম। এখন সে-গুড়ে বালি। মাত্র এই চার টাকা পকেটে নিয়ে আসতে ভালো লাগে? বল?

দিব্যেন্দু।। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোকে ভাবতে হবে না। আমার পকেটে তো টাকা আছে। আমি তোকে কাটলেট আর চা খাওয়াব। কী, খুশি তো?

অমল ।। বল, সব শুনে তুই রাগ করবি না! আমিও অবশ্য ঠাট্টা করেই বলেছি।

দিব্যেন্দু।। কী বলেছিস? কাকে বলেছিস?

অমল ।। বল, তুই রাগ করবি না। আমি দিব্যি কেটে বলতে পারি, আমি ঠাট্টা করেই বলেছি। স্রেফ ঠাট্টা।

দিব্যেন্দু।। আঃ বলবি তো ঠাট্টাটা কী? কাকে বলেছিস? আচ্ছা, বেশ, কথা দিচ্ছি—আমি রাগ করব না। তুই সব খুলে বল।

অমল ।। আমি তোর বৌকে আজ ফোন করে বলেছি.....

দিব্যেন্দু।। অ্যাঁ—আমার বৌকে? তুই তো জানিস ও খুব সরল মানুষ। তা তুই ওকে কী বললি?

অমল ।। আমি ভাই, সত্যি বলছি, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমার বৌ যখন তোর ফোনের কথা বলে, খুব কান্নাকাটি করে আমাকে মাত্র চারটি টাকা দিল, আমি তখন রাগের মাথায় তোর বৌকে ফোন করে বলেছি....ইস্ কী ভুল যে করেছি!

দিব্যেন্দু।। ওরে কী বলেছিস বল?

অমল ।। আমার এখন চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে! ছি ছি, এ কী করলাম?

দিব্যেন্দু।। আঃ বলবি তো কী বলেছিস?

অমল ।। বলছি ভাই, সব বলছি। আমি বলেছি দিব্যেন্দু আজকাল খুব মদ খাচ্ছে!

দিব্যেন্দু।। অ্যাঁ! আমি শুধু তোর বৌকে ঠাট্টা করে চা খাওয়ার কথা বলেছিলাম, তার বদলে তুই আমার বৌকে এত বড় মিথ্যে কথা বলতে পারলি?

অমল ।। আমিও তো ঠাট্টা করেই বলেছি। শুধু ঠাট্টার মাত্রাটা একটু বেশি কড়া হয়ে গিয়েছে।

দিব্যেন্দু।। এর ফলে কি হবে জানিস?

অমল ।। কী?

দিব্যেন্দু।। অশ্রুবন্যা! অগ্ন্যুৎপাত!! এবং ......এবং তুই তো তবু চারটে টাকা নিয়ে চায়ের দোকানে আসতে পারছিস। আমার তো বাইরে বেরুনোই বন্ধ হয়ে যাবে।

অমল ।। অ্যাঁ!

দিব্যেন্দু।। আর আমাদের দেখা হবে না ভাই! তোকে আজ শেষবারের মতো কাটলেট আর চা খাওয়াব! আগামীকাল থেকে আমি গৃহবন্দী!

পুরুষ মহল

'গাঁক্ গাঁক্' বিভাগ

সামলাচ্ছেন : **উন্মাদন দলপতি**

● জানেন, বিয়ের সময় আমার বউ কি সুন্দর ছিল দেখতে। কিন্তু এখন মোটা হয়ে গেছে। আমার বউ কি আগের মতো হতে পারে না?

—রামদাস চন্দ, খড়গপুর

❒ পারে। যদি আপনার হাত থেকে নিস্তার পায়।

● বিয়ে করা পুণ্য, তবে কি প্রেম করা পাপ?

—অমল ব্যানার্জী, হাবড়া

❒ পাপ কিনা জানি না তবে 'মনস্তাপ' না কি একটা শব্দ আছে যেন, খাল কেটে সেটা ঢুকে পড়ে।

● ভাই, আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে আমাকে আমার ইস্তিরির কাছ থেকে। সকাল থেকে যা কিছু ফাইফরমাশ আমি খাটি। কিন্তু তার বদলে আমার ভাগ্যে জোটে লাথি-ঝাঁটা, আরো কত কি। বলতেও লজ্জা করে। এই ইস্তিরি কি বদলানো যেতে পারে না?

—স্বপন দাস, কালিনগর, হুগলী

❒ হার্ডওয়ারের দোকানে জিজ্ঞাসা করুন।

● আমার বয়স ৪৬ বছর। আমার স্ত্রী আছে, সন্তানও আছে। কিন্তু আমার মিসেস একটুও রঙ্গ বোঝে না। আমি ভারি ভালোবাসি রঙ্গ-তামাসা করতে। কি করা যায়?

—বিনয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা

❒ এই বয়সে রঙ্গবাজি না করাই ভালো। আপনার স্ত্রী কোনটা বেশি ব্যবহার করেন—খুন্তি না মুড়োঝাঁটা?

● আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। এরপর কি করা উচিত?

—শ্যামল দাস, কলকাতা-৯

❒ আরেকটা ডিভোর্সের বন্দোবস্ত করে একটা বিয়ে করে ফেলা।

● পাগল হবার সহজ উপায় কি?

—রবীন্দ্র মাইতি, কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা

❒ মনের সেন্সরবোর্ডটা উঠিয়ে দেওয়া। তখন মন যা চাইবে তাই-ই করতে পারবেন। ও পাড়ার বৌদিকে দেখে ইচ্ছে করল—ছুট্টে গিয়ে একটা চুমু.....আগরওয়ালার ক্যাশবাক্সটা দেখে মনে হল—টুক্ করে হাত বাড়িয়ে বড় বাণ্ডিলটা......ব্যস্, পাগলামি বলতে পাগলামি, একেবারে পাগলামির চূড়ান্ত।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ : গণধোলাইয়ের জন্য কোম্পানি দায়ী নয়।

● আমার বউ দিব্যি নতুন নতুন প্রেম করে যাচ্ছে কিন্তু আমাকে পুরোটাই আঁচলে বেঁধে রেখেছে। এ বৈষম্য কেন?

—বিবেক বড়াল, কলকাতা-৭৩

❒ নিজের সম্পর্কে তাঁর রায়—ভ্রমর। আর আপনার সম্পর্কে?—No More.

● উন্মাদনবাবু, আপনার ছবিটি দেখে প্রেমে পড়ে গেছি। উন্মাদিনী প্রায়। একদিন দেখা করবেন?

—সাবর্ণী বসু, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

❒ মাত্র একদিনের জন্যে ক্যারেক্টার লুজ করে কী লাভ?

● উন্মাদনদা, আমি মোটেই উন্মাদ নই। তবু কোনো মেয়েকে প্রোপোজ করলে 'উন্মাদ' বলে হাসাহাসি করে। কেন বলুন তো? দোষের মধ্যে আমার দাঁত উঁচু, নাকটা থ্যাবড়া, চোখদুটো কুতকুতে আর একটু পেটরোগা, মাথায় চুল কম, গায়ে দাদ। এছাড়া আর কীই বা খুঁত আছে আমার?

—বিশ্বনাথ গড়াই, মুর্শিদাবাদ

❒ ঠিকই তো, আর কীই বা খুঁত থাকতে পারে!!

● আমি বিবাহিত, সন্তান আছে। তবু প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে একটা নতুন একজনকে বিয়ে করে ফেলেছি। কপালগুণে রাগারাগি করে তিনিও বাপের বাড়ি। প্রথম বৌ তো সে বাড়ির দরজা অনেকদিনই বন্ধ করে দিয়েছে। নতুনটাও গেল বুঝি। আমি এখন কাকে নিয়ে থাকি?

—অচিন পাত্র, বালিগঞ্জ, কলকাতা

❒ সাধটি কি? আপনার লক্ষ্য সাতটি কি? হলে এগোল সম্মুখে, না হলে যান এগোন সম্মুখে, না হলে যান নতুন শ্বশুর বাড়ির দোরে বুক ঠুকে।

● শুধু লম্বা বিনুনি দেখেই যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম, পুরো ডুবে যাওয়ার পর জানতে পারলাম, ওটা তার পরচুলো। এখন না পারছি তাকে ছাড়তে না পারছি কাছে টানতে। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

—ভবানী ভট্টাচার্য, বাঁকড়া, হাওড়া

❒ খুব সাধু ইচ্ছে। সব চুল ওপড়ানো হয়ে গেলে তুমিও একটা পরচুলো বানিয়ে নাও। তারপর, কোন চুলোয় আর যাবে, জয় মা বলে টেকো-টেকি ঢুকে পড়ো সংসারের ঢেঁকি-'কলে'।

মহিলা মহল

'ফিস ফিস' বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : **প্রাণঘাতিনী দেবী**

● বি. এ. না বিয়ে—কোনটা বেশি লাভজনক?

—তণিমা দে, সুভাষপল্লী, কলকাতা

❑ প্রথমটা লাফ-জনক, দ্বিতীয়টা Lough-জনক।

● আমি নারীবাদকে কেন্দ্র করে কবিতা লিখতে চাই। একটু টিপ্‌স দেবেন?

—বাসবী দাস, বনহুগলি, বরানগর

❑ কবিতা লিখবে কম, পুরুষের বিরুদ্ধে চেল্লাবে বেশি।

● শুনেছি কষ্ট করলে কেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তো কেষ্ট পেলাম না?

—আইভি রায়, বসুনগর, মধ্যমগ্রাম

❑ কেষ্ট কম পড়ছে নাকি? আমাদের যে দুধ দেয় তার নাম কেষ্ট, যে বাসন মাজে তার নাম কেষ্টর মা, মোড়ের মাথায় আছে কেষ্টর চায়ের দোকান..... আরো চাই!

● আমি প্রেমে পড়তে চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মোটা বলে কোনো ভ্রমরই এই ফুলে বসে না। কি করব বলুন তো?

—হাসিনা আমেদ, কলকাতা-১৭

❑ একটু মোটা দাগের প্রেম নিবেদন করতে পারো না? অনেক ভ্রমরই মোটা রাবড়ি, থুড়ি, পাপড়ি ভালোবাসে।

● পশ্চিমের দেশের ছেলেমেয়েরা একে অপরকে যখন খুশি 'I love you' বলে। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা, বিশেষত বাঙালিরা এই একগুচ্ছ শব্দ উচ্চারণ করতে এখনো হোঁচট খাচ্ছে কেন?

—ইভা দে, কলকাতা-৫

❑ গরিব দেশ তো, লাভের মুখ দেখতে পায় না।

● আমি যতবারই চেষ্টা করি ততবারই আমার পছন্দ হয় না। মানে বলতে চাই, যাকে পছন্দ করি বা ভালোবাসি সেই আমাকে পছন্দ করে না, আবার যে আমাকে ভালোবাসে আমি তাকে পছন্দ করি না। কী করা যায়?

—রাশি ঘোষ, মালদা

❑ যাকে পছন্দ করো তাকে অপছন্দ করতে শুরু করো। তখন যাকে অপছন্দ করো তাকে পছন্দ হয়ে যাবে। তারপর হাম্-তুম্!

● আমি একজনকে ভালোবাসতাম, কিন্তু সে অন্য একটি মেয়েকে ভালোবাসে। আবার ঐ মেয়েটি অন্য একটি ছেলের প্রতি আসক্ত। আবার ঐ ছেলেটি আমাকে ভালোবাসে, আমি আবার তাকে পছন্দ করি না। এই প্রেমচক্রের কি কোনো সমাধান হতে পারে?

—অনন্যা গড়াই, কলকাতা-৪৪

❑ পারে। চারজনেই পুরনো ছেড়ে একটা করে নতুন জুটিয়ে নাও।

● আমাদের পাশের বাড়িতে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্র-পৌত্র—এই তিনজনের মধ্যে দারুণ মারামারি, ঝগড়া, রেষারেষি। এদের চিৎকারে আমরা অতিষ্ঠ। তিনজনেরই শর্ত—তারা ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করবে। কী করলে এদের চিৎকার থামবে এবং আমরাও একটু শান্তি পাব?

—মণিকা দাস, কালিনগর, হুগলী

❑ একটি ভালো পাত্র দেখে মেয়েটিকে যমের বাড়ি, না না, শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

● একটা প্রবাদ আছে 'দিল্লির লাড্ডু যে খায় সেও আফশোষ করে যে খায় না সেও আফশোষ করে। একটা নমুনা দিন।

—আরতি মুর্মু, মেদিনীপুর

❑ বিয়ে।

● শিবপুজো করলে নাকি শিবের মতো বর পাওয়া যায়। তাই নাকি মেয়েদের, বিশেষত আইবুড়ো মেয়েদের করা উচিত এই পুজো। কিন্তু শিব তো মাতাল। তবে কি মাতাল বরই আমাদের আদর্শ।

—শিখা সাহু, কলকাতা-১৮

❑ নেশা করে। কিন্তু শিব যে মাতাল হয় তার প্রমাণ কি? পুলিশ কি কখনো লক্ আপে পুরতে পেরেছে?

● আদর্শ বা বরের উদাহরণ দিতে পারেন?

—সুস্মিতা দাস, বাঁকুড়া

❑ জবর। কিংবা খবর। শবরও হতে পারে। নাহলে অবশ্যই বর্বর।

● 'কি মোহিনী জান বঁধু'। আমাকে তো একেবারে ধরাশায়ী করেছেন। আর কত তীর ছুঁড়বেন? দয়া করুন, চলুন দু'জনে ভিক্টোরিয়ায় হাওয়া খেয়ে আসি।

—বনশ্রী সামুই, পুরুলিয়া

❑ কেন, ক্যাওড়াতলাও তো ভালো জায়গা—হাওয়া খাওয়ার পক্ষেও বটে, হাওয়া হওয়ার পক্ষেও বটে।

লেখা প্রকাশনীর উপহার

অধ্যা. জিয়াউদ্দিন আহমদ প্রণীত • মুহা. মনিরুজ্জামান অনূদিত
বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের প্রভাব ১০০

এ. টি. এম. রফিকুল হাসান প্রণীত
মুসলিম উৎসব ৪০

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) প্রণীত
হালাল রুজি ৪০

ড. কাওসার ইয়াজদানী রচিত
বড় পীর শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ৪৫

আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান সম্পাদিত
৫০ জন উচ্চশিক্ষিতা মহিলার ইসলাম গ্রহণ ৩৫

মাও. আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী রচিত
যিক্‌রে রাসূল ৪০

শামস নাবীদ উসমানী রচিত
হিন্দু ধর্মের গোপন কথা ৫০

অধ্যক্ষ নূর মহম্মদ খলিলুল্লাহ্ অনূদিত
আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মাদ (দঃ) ৮০

ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান প্রণীত কমপিউটার ও আল্‌-কুরআন ৬০, সুন্নত ও বিজ্ঞান ২৫, একশো জন অমুসলিম মনীষীর দৃষ্টিতে আল-কুরআন ২৫ • *মাওঃ তারিক জামিল ও শফিউল্লাহ কুরাঈশী প্রণীত* কে সে জন? ৫০, মৃত্যুর ওপারে ৩৫ • *কাযী সুলাইমান সালমান মানসুরপুরী প্রণীত* রাহমাতুললিল আলামীন (১, ২ ও ৩ খণ্ড) ৯০, ৯০, ১০০ • *মাওঃ আবুল বাশার জিহাদী প্রণীত* ইসলামের সত্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন (১ ও ২ খণ্ড) প্রতিটি ৩০, কেন মুসলমান হলাম? (১, ২ ও ৩ খণ্ড) ৫৫, ৫০, ৫০, এক নজরে সুন্নতে নববী ২০ • *হাবিব আহসান প্রণীত* মুসলিম নামকরণ নিয়ম ও রীতি ৬০, মহানবীর মু'জিযা ৬৫ • *মাওঃ আশরাফ আলী থানভী (র.) প্রণীত* তালীমুন নিসা ৫০ • *আব্দুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান প্রণীত* ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা ৫০ • *মাওঃ আবদুল খালেক প্রণীত* ছেরাজুছ ছালেকীন ৮০ • *ইমাম গাজ্জালী (র.) রচিত* এহইয়াও উলুমিদ্দীন (৬ খণ্ড) প্রতিটি ১০০, আল্‌-মুরশিদুল আমীন ৭৫, মিনহাজুল আবেদীন ৭৫, সিরাতুল মুস্তাকীম ২৫ • *মাওঃ আবদুস সালাম নাদভী প্রণীত* সাহাবা চরিত ৭০ • *স্যার সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত* হজরত মুহম্মদ (সঃ) জীবন ও শিক্ষা ৬০ • *অধ্যক্ষ নূর মহম্মদ খলিলুল্লাহ্ অনূদিত* ইনজীল বারনাবাস ৮০, গালিবের বাগানের কিছু ফুল (১ ও ২ খণ্ড) ২৫ ও ৩০, সুফী সাধিকা রাবেয়া বাসরী ৪৫ • *মাওঃ মাজহারউদ্দীন প্রণীত* বেহেশ্‌তের নূর ৫০ • *ডঃ আ. ফ. ম. আবুবকর সিদ্দীক প্রণীত* বিপ্লবী মুজাদ্দিদ আহমদ সিরহিন্দী (র.) ৭০, আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ ২৫, স্মরণকালের মরণজয়ী ২০, বাদশাহ আকবরের দীন-ই-ইলাহী ও মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র.) ২০ • *আবদুল্লাহ আল-মামুন আল্‌ সোহরাওয়ার্দী সংকলিত* সেইংস অব মুহম্মদ (দঃ) ৬৫ • *মোহাম্মদ হাদীউজ্জামান প্রণীত* এক নজরে মুসলিম জাহান ৫০ • *এ.টি.এম. রফিকুল হাসান প্রণীত* মডার্ন ইসলামীক ক্যুইজ ৪৫ • *মুহাঃ মনিরুজ্জামান প্রণীত* উপমহাদেশের মুসলমান ১ম : ৮০, ২য় : ৭৫ • *ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ প্রণীত* মানব জীবন ৫০, জীবন সৌন্দর্য ৫৫ • *এম. আকবর আলী প্রণীত* আলবেরুণী ৪০, ইবনে সিনা ৩০ • *মাওলানা আবদুল কাইউম অনূদিত* কুরআন-হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী ৪০, নামাজ শিক্ষা চিরস্থায়ী সময়সূচী সহ ১০, মহানবীর দেহাকৃতি ২৫ • *মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ জাযারী (র.) প্রণীত* হিসনে হাসীন ৬৫ • *মুফতী মাওঃ আবদুর রউফ প্রণীত* জাহান্নামের ছয় রমনী ২০ • *আবুল আনসার মোঃ আবদুল কাহহার সিদ্দিকী প্রণীত* আশেকে নবী ২০ • *আলহাজ্জ আবুল কালাম মল্লিক সংকলিত* হাদীসে রাসূল ২০ • *মোহাম্মদ আবীদ আলী প্রণীত* হাদিসের কাহিনী ২৫ • *এম. এম. জুহুরুদ্দিন আহমদ প্রণীত* ইসলামে মরমী প্রবণতা ৪০ • *মোঃ ফজলুল অহিদ রায়াকালাবী প্রণীত* মুক্তি সোপান ১৫, আখলাকে মোস্তাফা ও দু'আ শিক্ষা ২০, সোনালী জীবন ২৫, রমযানের অবদান ১৫, মহানবীর দরবারে শয়তান ২০, ইহলোকের অন্তরালে ৩০, ইসলামের আলো ২০ • *মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রণীত* মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা ৪০ • *মুহা. নূরুল ইসলাম প্রণীত* পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে ৪০ • *মোজাম্মেল হক প্রণীত* তাপস কাহিনী ২০ • *ভি. বালসারা প্রণীত* জেগে থাকি সপ্তসুরে ১২০ • *গৌরী দাস ও রেহানা মুনমুন প্রণীত* নানা স্বাদের রান্না ও জলখাবার ২৫ • *শেখ আজিবুল হক প্রণীত* কাজী নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য ১২০ • *সেকেন্দার আলী সেখ সম্পাদিত* ভারতীয় কিশোর গল্প ৪০ • *মুহাঃ মনিরুজ্জামান প্রণীত* ইসলামী বিশ্বের কিস্‌সা ৩০ • *সাহানা পারভিন প্রণীত* দাম্পত্য সুখের সন্ধানে ৩৫

✦ *মোহ. মামুনুর রশীদ প্রণীত* প্রথম পরিবার হযরত আদম ও বিবি হাওয়া (আ.) ২০, মহাপ্রেমিক মূসা (আ.) ৩০, চিশ্‌তী চেরাগের রোশনী ২০, আলোকময় দম্পতির খোঁজে ২৫ ✦ *মোহ. জুলকারনাইন প্রণীত* হযরত নূহ্ (আ.) ও মহাপ্লাবন ২০, দু'জন নবী যাঁরা বাদশাহ্ ছিলেন ২৫ ✦ *বুলবুল আজাদ প্রণীত* জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.) ২৫, হযরত ঈসা (আ.) আবার আসবেন তিনি ২৫ ✦ *আবদুল ওহাব খান প্রণীত* নবী-নন্দিনী ফাতেমা (রা.) ২৫ ✦ *এ. টি. এম. রফিকুল হাসান প্রণীত* বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তিন মসজিদ ৪০ ✦ *মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রণীত* যে সত্যের মৃত্যু নেই ৭০ ✦ *মাওলানা মুহম্মদ আশিক ইলাহী বুলন্দ শহরী প্রণীত* কিয়ামতের আলামত ২৫ ✦ *শাইখ আলী তানতাভী প্রণীত* আলোর দিগন্তে হযরত উমর (রা.) ৩০ ✦ *মোহ. মনিরুজ্জামান সংকলিত* নবজাতকের সুন্দর ইসলামি নাম ৫০

লেখা প্রকাশনী *প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা* ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ ফোন : ২২৪১ ৯৭১৮

Postal Regd. No.-Tech/WB/RNP-566/2002
PATRAPATH • Feb 2003 • Vol-3 Issue-7 • Regd. No.-WBBEN/2000/5855 • Rs. 8.00

৫২ বছরে পদার্পণের পর

সংসদের গতি অব্যাহত ...

নতুন নতুন অভিধান,

ছোটোদের বই, আকর গ্রন্থ,

সুসম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত চিরায়ত রচনা ...

শুধুই বেড়ে চলেছে তার নতুন প্রকাশনার তালিকা ...

শিশু সাহিত্য সংসদ   সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
ই-মেল : samsad@cal3.vsnl.net.in
ফ্যাক্স : ০০-৯১-৩৩-২৩৬০ ৩৫০৮, ফোন : ২৩৫০ ৭৬৬৬৯/৩১৯৫